পূর্ণেন্দু পত্রী

স্তালিনের রাত

অন্নপূর্ণা প্রকাশনা
৬৬নং কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
বিজয়কৃষ্ণ দাস
৬৬, কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮

মুদ্রাকর :
জি. চ্যাটার্জী
৭৫, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

প্র ব ন্ধ

আমার রবীন্দ্রনাথ

গত শতকের প্রেম

আসুন বসুন

কবিতার ঘর ও বাহির

সিনেমা সংক্রান্ত

পুরনো কলকাতার কথাচিত্র

উ প ন্যা স

মহারানী

ক বি তা

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ

আমাদের তুমুল হৈ-হল্লা

রক্তিম বিষয়ে আলোচনা

কথোপকথন ১

কথোপকথন ২

কথোপকথন ৩

কথোপকথন ৪

আটটি গল্পে গাঁথা এ বইয়ের তিনটে গল্প বেরিয়েছিল রবিবাসরীয় 'আজকাল'-এ। সভ্যতা ও সমুদ্রের মাঝখানে; দুখির মোটরবাইক, স্বপ্নে; স্তালিনের রাত; তুঁতে নীল; খামগুলি শারদীয়া 'আজকাল'-এ। অতল জলের গাড়ি শারদীয় 'প্রতিক্ষণ'-এ। পিতলের ঘটির মানচিত্র শারদীয় কালান্তরে। ওয়াটার কালারের বস্তী শারদীয় গল্পগুচ্ছে। আক্রোদিতির ভগ্নাংশ শারদীয় মনোরমায়।

স্তালিনের রাত মূলত প্রেমের গল্প। কিন্তু সেটা ঘটছে স্তালিনের মৃত্যুদিনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। আজকে যেমনই কাটা-ছেঁড়া হোক, তাঁর জীবিতকালে আর আমাদের সদ্য-যৌবনে স্তালিন ছিলেন সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির প্রতীক। আমার চতুর্থ গল্পের বইটি সাগ্রহে ছাপার জন্যে প্রকাশক সুধাংশু দে-কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পূর্ণেন্দু পত্রী

সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৬৪

সভ্যতা ও সমুদ্রের মাঝখানে

ধপধপে সাদা। তায় থেকে থেকে নীলের ডোরা। দেওয়াল রঙ করা হয়েছে মাত্র মাস দেড়েক আগে। এই আশ্বিনে, আশ্বিনের আকাশের রঙ।

নতুন হোটেল। এ অঞ্চলের সর্বাধুনিক। দোতলা। রাস্তা থেকে পাথরের সিঁড়ি। দুধারে পাম আর ঝাউ। প্রকাণ্ড লাউঞ্জ। অ্যামপ্লি-ফায়ারে গম্‌গমে হিন্দি গান। রিসেপশন কাউণ্টারে মিষ্টি হাসির অভ্যর্থনা। একশ কুড়ি টাকার ঘরগুলোয় সমুদ্র-মুখী দক্ষিণের বারান্দা। ঐরকম একটা বারান্দাওয়ালা ঘরেই আমরা দুজন। আমি আর আমার স্ত্রী ঊর্মি।

এই বারান্দাটা যেখানে শেষ, সভ্যতা থেমে গেছে সেখানেই। তারপরেই সমুদ্র। মাঝখানে অবশ্য চার কাঠার মত ফাঁকা জায়গা। পুরোপুরি ফাঁকা নয়। পুবদিকের কোণে ইট, স্টোন চিপস্‌ আর বালির ডাঁই। এই চার কাঠাতেই তৈরি হবে ওপেন-এয়ার গার্ডেন। রঙিন আমব্রেলার নিচে চেয়ার-টেবিল। পায়ের তলায় আফ্রিকান ঘাসের কার্পেট। টবে টবে সিজন ফ্লাওয়ার। মাটিতে মুশাণ্ডা, গোলাপ, যুঁই,

মালতী আর হরেক রকমের ক্রোটন। প্ল্যান তৈরি। মিউনিসিপ্যালিটিকে দিয়ে পাস করানো, যে আমলার যেমন নৈবিদ্যি যুগিয়ে। বাগানে হাত পড়বে শীতের সিজনে। এখন ওখানেই কারপার্কিং। সর্বক্ষণ গাড়ির জটলা। কনটেসা, টোয়েটো, ফিয়েট, অ্যামবাসাডার, মারুতি, আবার মোটরবাইকেরও। সামনের সমুদ্রের মতই একটা চঞ্চলতা সারা সময়, গাড়ির-আসা-যাওয়ায়। গর্জনও সমুদ্রেরই মত অনেকটা, ইঞ্জিনের খোলা-বন্ধের।

হোটেলের সামনে দিয়েই রাস্তা সমুদ্রে পৌঁছনোর। পৌঁছনোর মুখেই কার্তিকের চায়ের দোকান। খদ্দের কম থাকলে কার্তিক সুতো পাকায়। আর দোকানের সামনে পাতা সরু বেঞ্চে বসে গপ্পো। খদ্দের বাড়লে কার্তিক চলে আসে চা-য়ে। মালতী টোস্ট-ওমলেটে। তখনই ডাক পড়ে বাবলুর। ওদের ছোট ছেলে। কালো কুচকুচে পাতলা শরীর। পরনে একটা টকটকে লাল প্যান্ট। সম্ভবত পুজোতেই কেনা। গলায় সরু হার, শামুকের। চমৎকার মিষ্টি মুখ। যদিও সেটাকে মিষ্টি থাকতে দেয়নি সংসারের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। তার কচি মুখে বয়স্ক মানুষের পরিপক্কতার একটা পাতলা প্রলেপ। যখন হাসে তখনই কেবল বোঝা যায় মাত্র দশ / এগার বছরের এক দুধের বালক সে। কিন্তু হাসে অত্যন্ত কম। তবে আশ্চর্য আমাদের সঙ্গে একদিনের আলাপের পরই উর্মিকে দেখলে হাসে। তার কারণও আছে অবিশ্যি। আমি সাধারণত হোটেলের এই দক্ষিণের সমুদ্র-মুখী বারান্দা থেকে উঠি দিনে দুবার। মর্নিং আর ইভনিং ওয়াকে। আমারটা যথার্থই রেস্ট নিতে আসা, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মেনে। উর্মিই বেরোয় বেশি। প্রথমদিনই ওদের দোকানে লেবু-চা খেয়ে ভাল লেগেছিল উর্মির। তখনই বাবলুকে ডেকে বলেছিল, আর এক কাপ দিয়ে আয় তো ঐ বারো নম্বর ঘরের বারান্দার বাবুকে।

—যে বাবুর মাথায় ঝাঁকড়া চুল? চোখে চশমা?

আর সেদিনই বাবলুর কাছ থেকে খুচরো পয়সাগুলো ফেরত না নিয়ে উর্মি বলেছিল,

—তুই রাখ।

হোটেলে ফিরে উর্মির চোখ দুটো ঝক্‌মকে ঝিনুক।

—জানো, ছেলেটাকে দেখে মায়া পড়ে গেছে।

—কোন ছেলেটা ?

—তোমাকে চা দিয়ে গেল যে। বাবলু। ভারি ঠাণ্ডা। আর নম্র।

—বোন দুটোও তাই।

—বোন দুটো ? তুমি তাদের দেখলে কি করে ? আমি তো দেখিনি।

—কাল সকালে তুমিও দেখে নিতে পারবে। এই বারান্দার কোণাকুণি চাকা-লাগানো একটা কাঠের গাড়ি চোখে পড়েনি তোমার ? তবে, ঐ তো ওটাই তো বাবলুদের একটা বাড়ি। টেমপোরারি ঘর-সংসার।

—জানলে কি করে ?

—বেয়ারা খগেনকে জিজ্ঞেস করে করে জেনেছি।

—শোনো না, কথাটা পাড়বো ওর বাবার কাছে ?

—কি বিষয়ে ?

—বাবলুটাকে যদি আমরা নিয়ে যেতে চাই কলকাতায় ?

—বলে লাভ হবে না, দেখো। এই স্বাধীনতা ছেড়ে ওরা যাবে না।

—এখানে তো খেতে পায় না।

—শহরে তো শুধু খাওয়াটুকুই পাবে।

—বেশ তো, তাই-ই যদি পায়, খাওয়াটি কি মাগ্‌না নাকি ?

—তা নয় ঠিকই। কিন্তু আমরা তো খাঁচার দিক থেকে পাখিকে দেখছি।

পাঁচদিনের মাথায় উর্মি কথাটা তুলতে পারে মালতীর কাছে। এই কদিনে বেশ ভাবসাব জমে গেছে দুজনের। সকাল সন্ধেয় গল্প চলে খানিকক্ষণ। খাতির করে কথা বলে কার্তিকও। কিন্তু উর্মির প্রস্তাবে

ছজনেই জানিয়ে দিল তাদের অসম্মতি। তবে মালতী দিয়েছিল একটা পাল্টা প্রস্তাব। ছুই বোনের যে-কোনও একজনকে নিয়ে যেতে চাইলে, রাজি।

আমার মুখে মেয়ে ছুটোর কথা শুনে ঊর্মি খুঁটিয়ে দেখেছে ওদের। বকু আর পারু। বকু ন'বছরের। পারু সাত কি ছয়। বকুর মাথা ভর্তি উকুন। ছজনেরই গায়ের রঙ ময়লা। তবে তুলনামূলকভাবে পারু একটু ফর্সা। বকুর নাকে নোলক। পারুর কানে সজনে-কুঁড়ির মত ছোট্ট ছুল। বকুর ফ্রকটা কোমরের কাছে ছেঁড়া। পারুর ফ্রক বগলের কাছ থেকে। ছুই বোনের মধ্যে পারুই বেশি ছটফটে। দৌড়ে-ঝাঁপিয়ে কাজ। আবার কথা বলে যখন, পাকা গিন্নি। যেন বহু বছর এই পৃথিবীর সমাজ সংসারের গভীর জলের ভিতর হাঁসফাঁস কাটিয়ে উঠে এসেছে ডাঙায়। তার বিচার-বিবেচনা বা নির্দেশের কাছে বকুও মচকানো ডাল। ঝগড়াও হয় ছু-বোনের। সে ঝগড়াতেও পারুর খ্যানখ্যানে গলাটাই সপ্তমে। আবার কাঁদতে কাঁদতে যদি ছোটে বাবা মার কাছে নালিশ করতে, তখনও তার কান্নাটা বকুর মত ফুঁপিয়ে নয়, ফাঁপিয়ে। কোনও কোনও সময় ঝগড়ার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেও চিটেগুড়ের মত চটচটে ঝগড়া থামাতে না-পেরে, বাবলু ছজনকেই ঠ্যাঙায়। চড়-চাপড় বা একটা ছুটো কিল।

বাবলু ফড়িঙের লাফে আসে, ফড়িঙের লাফে চলে যায়। ওরা ঐখানেই থাকে। ঐ চাকা-লাগানো গাড়িটার গা ছুঁয়েই। গাড়িটা কার্তিক বানিয়েছিল গত বছর, অনেকগুলো টাকা ঢেলে। টাকা ঢালার পিছনেও ছিল তার অনেকখানি পাকা হিসেব। চাকা-লাগানো ঠেলা গাড়ির সুখ-সুবিধের দিকটা খতিয়ে দেখে তবেই কিনেছিল কাঠ-কাটরা। সুবিধে এই যে সমুদ্রের ধারের দোকান বারোমাস চলবার নয়। বছরের ছুটো তিনটে সিজনেই এখানে ট্যুরিস্টদের ভিড়। তারপর মাছি তাড়ানোর অবস্থা। দোকানটাকে গাড়ির মধ্যে ভরতে পারলে, পড়তির সময় চলে যেতে পারে এদিক-সেদিক। মেলায় কিংবা হাটে,

কিংবা অন্য কোনও পুজো-পার্বণের ভিড়ে। চাকা-লাগানো নতুন দোকানটা নিয়ে সমুদ্রের বাঁধে সবে বসতে শুরু করেছে। হঠাৎ একদিন সন্ধের মুখে তাণ্ডব। পুলিসী লাঠির ভাঙচুর। হটো, হট্ যাও, ভাগো শ্যালা-আ-আ। মিউনিসিপ্যালিটি বিউটিফিকেশন করবে। দোকান হটাও।

মিউনিসিপ্যালিটির সৌন্দর্য-বিলাসীরাই কার্তিকের গাড়িটাকে দশ হাতে বাঁধ থেকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল এইখানে। দমাদ্দম লাথি বা লাঠির ঘায়ে খানিকটা ভাঙা, খানিকটা নড়বড়ে হয়ে-যাওয়া গাড়িটা সেই থেকেই হোটেলের এই ফাঁকা চত্বরে। এর ভিতরেই ওদের দোকানের জিনিসপত্তর। আবার অস্থায়ী সংসারেরও। অস্থায়ী, কারণ ভোর থেকে রাত নটা সাড়ে-নটা পর্যন্তই ওরা থাকে এখানে।

রাত্রে শুতে যায় মাইল দেড়েক দূরের গ্রামে, নিজেদের চালাঘরে।

—তোমার ভাল লাগে না ওদের ?

—তুমি যে এত ভাল লাগার কি খুঁজে পেলে, সেটাই তো বুঝলাম না। ছোটটা তো মুখরা। ক্যাটক্যাট করে কথা বলে। চলা-হাঁটাও অভব্য। বড়টা এমনি শান্তশিষ্ট হলে কি হবে, ওর তো মাথা ভর্তি উকুন। সারাক্ষণ নাক খুঁটছে।

—উকুন তো কারও চরিত্রের দোষ নয়। শান্তিনিকেতন থেকে তোমার বোনঝি কলকাতায় আসে যখন, তারও তো একমাথা উকুন। তাকে কি শুতে-বসতে-থাকতে দাও না ?

—তর্কে তো তোমার সঙ্গে পারব না। আমি যা বলার সত্যি বলব, ওরকম নোংরা শুঁটকি মাছের মত মেয়েকে পুষতে গা ঘিনঘিন করবে আমার।

ঊর্মি ঘুরে বেড়াতে পারে। বেড়াচ্ছেও। সমুদ্রের হাওয়ায় শ্বাস নিতে আমাকে দিনের অধিকাংশ সময় বসে থাকতে হবে এইখানে। দক্ষিণের বারান্দার এই বেতের চেয়ারে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তেই যা অল্প একটু হাঁটাহাঁটি সী-বীচে। যতক্ষণ বেতের চেয়ারে, সভ্যতা আর সমুদ্রের

মাঝখানে কার্তিকের ঐ চাকাওয়ালা গাড়ি আর গাড়ির সঙ্গে জুড়ে থাকা ঐ দুটো মেয়ের জীবনযাপনই আমার কাছে প্রধানতম দৃশ্য।

একটু আগে দৌড়ে এল বাবলু। গাড়ির পিছন দিকের পাল্লা খুলে বের করল একটা বড় শশা। মাখন কাটার লম্বা ছুরিতে চারফালা করে মাখালো নুন-ঝাল। নিজে দু-ফালি নিয়ে বাকি দু-ফালি দু-বোনকে। শশা খেতে খেতেই বাবলুর দৌড় সমুদ্রের দিকে, দোকানে। দূর থেকে দুই বোনকে কিছু একটা খেতে দেখে ছুটে এল কেলো। ওদের পোষা কুকুর। কাছে এসে শশার গন্ধে বিতৃষ্ণায় মুখ নামিয়ে নিলেও, দূরে চলে গেল না। শুয়ে পড়ল ওদের পায়ের কাছে। ধুলো বালির ঝটকায় ওদের ঢেকে দিয়ে একটা মারুতি সাঁৎ করে ঢুকল ঐ চত্বরে। পার্ক করল ব্যাক গিয়ারে পিছু হটে। গাড়িতে প্যাসেঞ্জার নেই। শুধু ড্রাইভার। গাড়ির পিছনের হুড খুলে সে অর্ধ-উলঙ্গ হল সমুদ্রস্নানের পোশাক পরতে। ধুলোর পর্দা সরে গিয়ে ওদের দুজনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন আবার, তখন শশা খাওয়া প্রায় শেষ। এঁটো চটচটে ভেজা হাতটা প্রথমে শুকনো ঘাসে পরে ফ্রকে মুছে বকু রাবার ব্যাণ্ডে বাঁধা তার চুলগুলো খুলে ছড়িয়ে দিল আঙুলের চিরুনিতে টেনে টেনে। বসল হাঁটু মুড়ে। মাটিতেই। দূর থেকে মনে হবে যেন পায়ের তলায় পেতে নিয়েছে কালো চট। আসলে ওটা কাঠের গাড়ির ছায়া। বকু এভাবে বসলে পারুকে কি করতে হবে যেন মুখস্থ। সেইভাবেই, নিজের শশা খাওয়া নুন-ঝালের হাতটাকে চূড়ান্ত চেটে নিয়ে, চেটেই হাত দুটোকে ধুয়ে-মুছে, বসল বকুর পিছনে। উকুন মারতে। উকুন মারতে মারতেই ওদের দুজনের অন্তরঙ্গ কথোপকথন। যে পৃথিবী ওদের অজানা, যে-সব মানুষ ওদের কাছে বিস্ময়কর, তাদেরই ইতিহাস নিয়ে আলোচনা।

—লাল শাড়ি পরা উই যে বৌটা যাচ্ছে চান করতে, অর ছামি হল উই মুটকো নোকটা। সুমুদ্দে গিয়ে এগদম চান করতে পারেনি। দেখেছি। শুদু গড়াগুড়ি খায় বালিতে। আর হাসে।

—ছুর, অর ছামি ত গলায় সোনার চেন পরা ফার্সাপানা নোকটা। বুকে খুব লোম।

—তুই কি করে জানলু?

—রিস্‌কায় চেপে ঘুরতে দেখেছি দুজনকে। ছামি-স্তি না হলে অমন করে ঘুরে নাকি?

—কালকে লাল মারুতি থেকে যে বৌটা নামল, কি ফার্সা, তাই না?

—তার বুনটা আরো ফার্সা।

—কুন বোনটা? চখে কালো চশমা। গগ্‌লস?

—এই তো আজ সোকালে সমুদ্দের দিকে হেঁটে গেল, হাতে কামেরা লিয়ে।

—অ-মা, আমি দেখতে পেনুনি যে! আমি ত্যাখন কোতায় ছিনু?

—তুই গিছলু কোতাকে যেন। দুকানে কয়লা দিতে বোদায়।

—নীল গাড়িটায় চেপে সিদিন এল যারা, তাদের মদ্যে যে মেয়েটা শালোর পাঞ্জাবি পরে, বাঃ ব্যা কী ঢোঙি! সব সোময় বেটা ছেলের গায়ে গা ঘেঁস্‌টিয়ে হেসে ঢলাঢলি। আর কি সিগারেট খায় বাবা!

—ছ্যাখ, ছ্যাখ, কি পেল্লাই গাড়ি ঢুকল একটা। ডাইভারটাকে ছ্যাখ। মাতায় টুপি। ছাহেবের গাড়ি নাকি লো?

—মন্‌তির গাড়ি-টাড়ি হবে হয়তো তো। কনটিসা গাড়ি।

—ফিলিম ইস্টারেরা এল নাকি ছ্যাখ আবার।

—ফিলিম ইস্টার রোজ রোজ এসবে নাকি? গত হোপ্তায় এসেছিল যারা তারা তো তিনদিন থেকেই চলে গেছে।

—তারা তো কনটিসাতেই এসেছিল। কনটিসার অনেক দাম, তাই না?

—তা তো হবেই। মুটরবাইকেরই তো কত দাম।

—কত দাম?

—বাঃ সাঁতরাদের ছেলেটা কিনেছি নি একটা? দশাজার না কত দিয়ে।

–বাবা যে বলেছিল ছাইকেল কিনবে, কি হল রে ?

–বাবা উ রকম বলে। তবে আমি একটা গোপন কথা শুনে ফেলেছি। কারুকে বলবি নি কিন্তু ?

–মা কালীর দিব্যি। কারুকে বলবনি। বললে জিবে পোকা পড়বে।

–বাবা বোদায় চায়ের দুকান তুলে দিয়ে মাছের ব্যবসা করবে। বেঙ্কের লুন পাবে।

–অ্যাই যা-আ-আ

–কি হল লো ?

–বাসি ভাতের হাঁড়িতে জল ঢালা হয়নি।

পারু দৌড়ে উঠে যায়। বকুও উঠে দাঁড়ায় মাথার ঘাঁটা চুল ঝাঁকিয়ে। ঠিক তখনই গোটা পাঁচেক কুকুরের পৃথিবী-কাঁপানো কামড়াকামড়ি-চিৎকার, আট নম্বরের বারান্দা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া বাসি খাবারের বখরা নিয়ে। কেলোও তড়িঘড়ি দৌড়য় সেদিকে, বিকট হাঁকে। বকু অপেক্ষা করে পারুর জন্যে। পারু এলে ওরা দুজনে ঘুরবে পার্ক-করা গাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। ফেলে দেওয়া ডাব কুড়োবে। দশটা ডাব কুড়োলে তার একা-দুটোয় পুরু নেয়া থাকবেই। যারা গাড়ি হাঁকিয়ে আসে, তারা নেয়াপাতি ডাবের জল খায়, নেয়া খায় না। ওরা জানে। জানে বলেই ওদের দুজনের হাঁটার ভঙ্গিটা নিশ্চিন্ত। গাড়ি-চড়া মানুষের পৃথিবীতে ওদের খাদ্যাভাবের আকাল ঘটবে না কখনও, এইরকম একটা স্থির প্রত্যয় যেন স্নিগ্ধ করে রেখেছে ওদের হাড়গিলে শরীরের রোগা রোগা মুখের ডাগর চাউনিকে।

দুখির মোটরবাইক, স্বপ্নে

খুন হয়েছে এক গাঁয়ে। ইস্কুল আর এক গাঁয়ে। গাঁ হিসেবে আলাদা। কিন্তু গ্রামীণ সম্পর্কে আলাদা নয়। বরং ঠাসবুনোনে জোড়া। যে গাঁয়ে ইস্কুল, সে-ইস্কুলে পড়তে আসে এপাশ-ওপাশ চারপাশের গাঁয়ের ছেলে। যে গাঁয়ে খুন হয়েছে সে গাঁয়ে যে রেশন শপ, সেখানেও তেমনি দশ গাঁয়ের লোকজনের আনাগোনা।

যে গাঁয়ে খুন হয়েছে সেই গাঁয়ের পঞ্চানন সাউ এ গাঁয়ের স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার। খুনের ঘটনার সঙ্গে পঞ্চানন সাউয়ের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। কিন্তু খুনের ব্যাপারে ধরা পড়েছে যারা, তাদেরই একজন রতন মাইতি। রতন মাইতি পঞ্চানন সাউয়ের শালা, তার বাবা গঙ্গাধর মাইতি রেশন শপের মালিক। আত্মীয়তার টানেই হয়ত পঞ্চানন মাস্টারকে দৌড়তে হয়েছে মহকুমার থানায়। ইতিহাসের ক্লাসের পর বাকি ছিল আরও দুটো ক্লাস। কিন্তু হেডমাস্টার ছুটি দিয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি। পঞ্চানন মাস্টার স্কুলে আসেনি বলেই ছুটি নয়। যে গাঁয়ে খুন হয়েছে সেদিক থেকে দুটো-একটা বোমা ফাটার শব্দ কানে এসেছে তাঁর। দিনকাল খারাপ। তাই বাচ্চাকাচ্চাদের সন্ধের আগে তাড়াতাড়ি

বাড়ি পাঠিয়ে দিতেই এই সিদ্ধান্ত। ক্লাস ফোরের তুখি আর পোরে, ক্লাস ফাইভের ননী আর তারক, ক্লাস সিক্সের মাখন—ওরা পাঁচজনে একটা জোট। একদিকে বাড়ি। তাই একসঙ্গে স্কুলে আসে, একসঙ্গে ফেরে। স্কুলের মাঠ পেরিয়ে শর্টকাটের ধানজমি আড়াআড়ি ডিঙিয়ে ওরা সরু বাঁধে উঠতেই মাখনের সহপাঠী ঋষির ডাক—এ্যাই মাখনা দাঁ-আ-আ-আ-ড়া-আ-আ-আ।

কাস্তের ধানকাটার মত খচ্‌খচ্‌ শব্দে শুকনো মাঠের নাড়া মাড়িয়ে ঋষি দৌড়ে বাঁধে ওঠে।

—তোদের সঙ্গে যাব-ও-ও।

ঋষি বলে হাঁফাতে হাঁফাতে।

—আমাদের সঙ্গে কোথাকে যাবি তুই ?

—উদিক দিয়ে বাড়ি যাবনি আজ। তোদের উদিক দিয়ে সাঁকো পেরিয়ে পিছন দিক দিয়ে যাব।

মাখনা গলায় পাখির ডানার ঝাপটা তুলে হাসে।

—তুই শালা ভয় পেয়ে গেছু। বোমাবাজির ভয়।

প্যাঁচার মত গোল হয়ে যায় ঋষির চোখ।

—ঈস্‌, বোমাবাজির ভয়! ভয়, না কাঁচকলা।

—তাহলে উদিক দিয়ে যাচ্ছুনি কেন ?

—মোদের গেরামে কি ঘটবে সে তুই জানু নাকি ? কাল রাত থেকে ঘোঁটপাট চলছে। রতন মাইতির অ্যান্টি-পাটি এগদম তৈরি হয়ে আছে। জামিন তো পাবেই। টাকার জোরে জোর। জামিন পেয়ে ফিরলেই লাশ শুইয়ে দেবে।

ঋষি আর মাখনই কথা বলেছে এতক্ষণ। বাকি পাঁচজন রা কাড়েনি। পোরে এই প্রথম মুখ খোলে।

—উ রতন মাইতি এখন একটা ধুমসো মতন মুটোর বাইক কিনেছে, তাই না ?

ঋষি বই-খাতার ঝোলানো ব্যাগটাকে এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে আনতে আনতে বলে,

—মুটোর বাইক তো কিনেইছে। মাথায় মিলিটারির মত টুপি। চোখে গগ্‌লস। ইদিকে গায়ের রঙ কেলে ভূত। উদিকে ওমিতাভো বচ্চনের মত কাপ্তেনি ইস্টাইল পোশাকের।

তারক সবাইকে চমকে দিয়ে

—গলায় আবার সোনার লকেট। তাতে সাঁইবাবার ছবি।

ইতিহাসের মাস্টার পঞ্চানন সাউয়ের মত ধমকানি তখুনি মাখনের গলায়।

—তুই কি করে তার গলায় লকেট দেখবি র‍্যা ? এঁ্যা ?

—না দেখে বানিয়ে বলতেছি নাকি ? গতবারের আগের হাটবারে দেখেছি। দোকানে বসেছিনু। ঠিক মোদের দোকানের সামনেই মুটোর বাইকটা থামিয়ে একজনের সঙ্গে কথা কইতেছিল। কথা কইতে কইতে সিগারেট খাচ্ছিল। তখন দেখেছি। মুটোর বাইকটা থেমেছিল। তবু ভটর ভটর ভটর ভটর সে কী শব্দ। বুক ধুক্ ধুক্ করে উঠে।

সকলে বুঝতে পারে তারকের কথাটা বিশ্বাসযোগ্য। সোম আর শুক্র-বারের হাটে তার বাবা দোকান দেয় আলু, বেগুন, আদা, পেঁয়াজ, শাক সজির। তারকের বাবা বুড়োসুড়ো। চোখে ছানি। আগে বাবাকে সাহায্য করত ওর দাদা। সে এখন ইটভাঁটিতে চাকরি করছে। তাই বাবাকে সাহায্য করতে তারক হাটবারে হাটবারে দোকানে গিয়ে বসে, স্কুল কামাই করে।

—আমি যা দেখেছি, সে তোরা কেউ দেখুনি।

এবার ননীর গলায় গোয়েন্দাকাহিনীর সাসপেন্স। আর তখুনি মাখনের গলায় আবার সেই পঞ্চানন মাস্টারের ধমক।

—ইয়ার্কি মারাচ্ছিস ? তুই শালা দেখবি কি করে র‍্যা ? অ্যাঁ ? ভড়কি মারা ?

পোরে, তারক, তুখি তাদের শরীর হেলিয়ে-তুলিয়ে ফিক্‌ফিক্‌ হাসিতে সমর্থন জানায় মাখনকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ননী যেভাবে বর্ণনা করে ঘটনা, অবিশ্বাস করার উপায় থাকে না কারও।

ননীদের সংসার চলে পান বেচে। তিনটে পানের বরোজ। সবই তার বাবা দেখে। তাকে কিছু দেখতে হয় না। কিন্তু সপ্তাহ দুই আগে পানের মোটের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ভূষণ সঙ্গে নিয়েছিল ননীকে। ননীদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে ইস্টিশান। বাগনান। পানের আড়ত সেইখানেই। সেই আড়তের কাছাকাছিই উল্টোদিকে সিনেমা হল। ভূষণ যখন আড়তে পাওনা-গণ্ডার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত, ননী হাঁটছিল রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতেই সিনেমা হলের সামনে। আর সেই সময়েই রতন মাইতির মোটর বাইকটা এসে থেমেছিল ঠিক তার সামনেই। ননী ছিটকে সরে গিয়েছিল ফুটপাথে। ফুটপাথে সরে গিয়েছিল বলেই তার আরও স্পষ্ট করে চোখে পড়েছিল দৃশ্যটা। সিনেমাতে দেখা যায় যে-সব মেয়েদের, সেই রকমই একটা মেয়ে জড়িয়ে আছে রতন মাইতির কোমর। যেন বাঁশের খুঁটি জড়িয়ে উচ্ছে কি ঝিঙের লতা। ননী নাকি তার জীবনে অমন পরমাসুন্দরী আর দেখেনি কখনও। ননী থামে। পোরে তাকে থামতে দেয় না।

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ?

—মেয়েটাকে নিয়ে রতন মাইতি কি করল ?

—কি আবার করবে ? সিনেমা দেখাতে নিয়ে এসেছে। টিকিট কেটে সিনেমা হলে ঢুকে গেল।

—আর মুটোর বাইকটা ?

—মুটোর বাইকটার আবার কি হবে ? মুটোর বাইক নিয়ে কি আর সিনেমা হলে ঢুকবে নাকি ? বাইরে চাবি দিয়ে রেখে গেল। আরও সব মুটোর বাইক ছিল যেখানে, তার পাশে। বাগনানের উদিকে কত যে মুটোর বাইক সে তুই গুণে শেষ করতে পারবিনি।

ডুখি দলের মধ্যে থেকেও তখন একলা। সেই-ই শুধু মোটর বাইক দেখেনি এখনও। দেখবেই বা কখন? এ অঞ্চলে মোটর বাইক তো ঐ একজনের। রতন মাইতির। তার বাবা গঙ্গাধর মাইতি। রেশন শপের ডিলার। বাবার পয়সা উড়িয়ে মাস্তানি করেছে এতদিন। বছর খানেক হল নেমেছে কনট্রাক্টরির ব্যবসায়। আর মোটর বাইকটা কিনেছে তো মাত্র মাসখানেক আগে। এই মাসখানেকের মধ্যে ডুখি নহাটির হাটে যায়নি। হাইওয়ের ধারে পাকা বাজার। তারই গা ছুঁয়ে সোম শুক্রুর হাট। রতন মাইতির আসা-যাওয়া ঐ হাইওয়ে দিয়েই বেশি। চৈতন-পুরের কাছে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে নতুন। তারই কনট্রাক্টরি।

মোটর বাইক বিষয়ে কিছু বলতে না পেরে ডুখির ভিতরটা কোলা ব্যাঙের পেটের মত ফুলে ফুলে ওঠে। ব্যাঙের লাফের ধরনে কিছু একটা বলে ওঠার জন্যে তার গলা জিভ উস্‌খুস। কিন্তু মাথা হাতড়িয়ে খুঁজে পাচ্ছে না কিছু। স্কুলে-ক্লাসে-খেলার মাঠে ফুটবলের মত লাফিয়ে বেড়ায় যে, মোটর বাইকের প্রসঙ্গে সে যেন খোলসে-আটকানো শামুক। মোটর বাইকের সুতো ধরেই আলোচনাটা ফিরে আসে আবার খুনের প্রসঙ্গে। কে খুন, কেন খুন, রতন মাইতি সত্যিই খুনী কিনা এই সব কথার মধ্যেই হঠাৎ ডুখির গলায় যেন কাঁসির টং।

—তোদের সকলের চেয়ে আগে মুটোর বাইক দেখেছি আমি, সেটা জানিস?

চাঁটি মারার জন্যে হাত তুলেও, চাঁটি না মেরে, ডান হাতের মুঠোয় ডুখির মাথাটাকে উপর থেকে খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে মাখন বলে, —মায়ের পেটে থাকতে থাকতে দেখিসনি তো?

মাখনরা আবার নিজেদের আলোচনায় ফিরে আসে। ডুখি তার শরীরটাকে সাপের মত বাঁকিয়ে মাথাটাকে মাখনের খামচা থেকে বাইরে এনে অল্প একটু দৌড়ে যায় সামনের দিকে। তারপর ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গলার আওয়াজটাকেই ছুঁড়ে দেয় বাগানো ঘুঁষির মত। —আমার কথায় বিশ্বেস করতেছুনি তো? থালে চল আমাদের বাড়িতে।

মায়ের কাছে চল। মাকে জিজ্ঞেস করবি চল তিন বছর আগে মুটোর বাইক দেখেছি কিনা। মায়ের সঙ্গে দেখেছি। মা বাবা সকলের সঙ্গে। চল, জিজ্ঞেস করে ভজাবি চল, সত্যি বলতেছি না মিথ্যে বলতেছি।

প্রিয়নাথ মাস্টারের বদলে মাখনের গলায় এবার হেড মাস্টারের শাসানি।

—চেল্লাছিস কেন? দেখেছিস, বেশ করেছিস। অত হামলাবার কি আছে? তোকে কি জিজ্ঞেস করেছে কেউ দেখেছিস কি দেখিস নি? ফের চেল্লালে মারব এক গাঁট্টা।

—গাঁট্টা মারবি? মেরে ছ্যাখ্ না। তুই কেন মোড়লি করতেছু? আমি কি তোকে একাকে শুনোনোর জন্যে বলতেছি নাকি কিছু? আমি বলতেছি আমার বন্ধু পোরেকে। তোর চামড়ায় ফোস্কা পড়তেছে কেন?

—ফের তড়পাচ্ছিস তুই? আমরা কথা বলতেছি, একটা ঘটনা শুনতেছি। মেলা ভ্যাক ভ্যাক করিসনি। ফের চেল্লালে, চিৎপাত শুইয়ে ত্থবো মাটিতে।

মাখনের গলার চড়া স্বরকে ছাড়িয়ে ত্থখি চড়িয়ে দেয় নিজের গলা। চিরকালের ডানপিটে সে। ঝগড়া-মারামারির গন্ধে তার রক্তে যেন যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয় কেউ। টঙ্কার দেওয়া গাণ্ডীবের মত তার শরীর প্রস্তুত হয়ে যায় সম্মুখসমরের মোকাবিলায়।

—ওরে আমার গাজ্জেন রে! ওনার কথায় উঠ্ বোস করতে হবে মোকে। চিৎপাত করে শুইয়ে দেবে মাটিতে?

মাইরি? তবে শোয়া এবার। আয় মুরোদ থাকে তো শোয়াবি আয়।

এক ঝটকায় পকেট থেকে পেনসিল কাটার ছুরিটাকে খুলে, যেন হিন্দি সিনেমার ভিলেন, অবিকল সেই ভঙ্গিতে ত্থখি মাখনের সামনে। মাখন আচমকা ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পোরে ছুটে এসে জাপটে ধরে ত্থখির ডানহাতের কব্জি। ওদের সকলের মধ্যে শক্ত শরীর

তারই। ছুখি হাত নাড়াতে পারে না আর। পোরে এরপর বাঁ হাতে ছুরিটা ছিনিয়ে নেয় তার মুঠো থেকে।

—গানডু। তুই একটা আস্ত গানডু। ছুরি বের করে মাস্তানি দেখাচ্ছু? মাস্তানি মারাতে গেল ট্যাঁকের জোর চাই। রতন মাইতি মাস্তানি করে তার নিজের পয়সা আছে, বাপেরও পয়সা আছে। থানা পুলিস টাকা দিয়ে কেনা। তুই শালা পান্তাভাতের আমানি খেয়ে পেট জয়ঢাক করার পার্টি। চাকু দেখাস ক্লাসমেটদের? ছিঃ।

২

রাত্রে ছুখির বুকটা পাকা বিষফোঁড়া। খেলাধুলো, ডুব সাঁতার, ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা, অষ্টমী পুজোয় ধুনুচি নাচ, এক দিকে তার এত সব প্রশংসনীয় দক্ষতা সত্ত্বেও, আজ সে নিজের সহপাঠীদের কাছে হেরে ভূত। হেরে যাচ্ছে দেখেই বুক বাজিয়ে বলেছিল, তিন বছর আগে দেখেছি। বলেছিল গোঁ-এর মাথায়, জিতবার জেদে। ওরা চ্যালেঞ্জ করলে কি বলবে তারও খসড়া বানিয়ে নিয়েছিল ভেবেচিন্তে। ঠিক তিন বছর আগেই সে তার মেজ মাসীর বড় মেয়ের বিয়েতে গিয়েছিল শ্রীরামপুরে। একা নয়, বাড়ির সকলের সঙ্গে। তখন শীতের সময়। ছুখিরা পৌঁছবার অল্প কদিন আগে পর্যন্ত সেখানে সার্কাস হয়ে গেছে মাস খানেক ধরে। মাসতুতো ভাইবোনেদের মুখ থেকে অনেক গল্প শুনেছে সার্কাসের খেলার। তার মধ্যে একটা খেলা ছিল মোটর বাইকের। আগুন জ্বলছে লোহার গোল চাকতিতে। তার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে চলে যাবে মোটর বাইক আরোহী-সহ। শুনতে শুনতে চোখে দেখার মত সত্যি হয়ে উঠেছিল দৃশ্যটা।

ঠিক কান্না নয়। ক্রমাগত ছোবল-মারা এক ধরনের অস্থির অস্বস্তির চাপে ঘুমোতে পারে না সে। ঘুম আসে অনেক দেরিতে। ঘুম গাঢ় হলে, স্বপ্নের ভিতরে সে পেয়ে যায় এক আশ্চর্য মোটর বাইক। ধান ভানার ঢেঁকির ছুদিকে ছুটো চাকা লাগানো। চাকা ছুটো সাইকেলের চাকার মতই, তবে তার চেয়ে মোটা। যেহেতু ছুখি কখনও মোটর বাইক দেখেনি,

সুতরাং ওটা সত্যিকারের মোটর বাইক কিনা এ নিয়ে স্বপ্নে সে কোনও প্রশ্ন তোলে না। মোটর বাইক চালানোর বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই তার। কিন্তু স্বপ্নে তাকে মোটর বাইক চালাতে হয় না। সে শুধু মোটর বাইকের উপর বসে থাকে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল। মোটর বাইকই তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে মহাশূন্যে। এবং নিঃশব্দে।

গোড়ার দিকে তার বুকে খুশির ঢাক-ঢোল। পোরে, ননী, তারক, মাখনরা মোটর বাইক দেখেছে শুধু। চাপেনি কখনও। এবার ওদের বুক টাটাবে ঈর্ষায়। ঈশ্, তুখি একটা আস্ত মোটর বাইক পেয়ে গেল? কিন্তু মনের খুশিটাকে নিয়ে বেশিক্ষণ নাড়াচাড়া করতে পারে না সে। স্বপ্নে যে পারাপারহীন মেঘলোকের ভিতর দিয়ে তার মোটর বাইকটা ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে, সেখানে তাকে ঘিরে থাকে এমন সব রঙ, যা সে আগে দেখেনি কখনও। মেঘের অজস্র ভঙ্গি আর তাদের রঙের অজস্র বৈচিত্র্য দেখতে দেখতে তুখির ভিতরটা হাঁফিয়ে ওঠে। এবং সে ভয় পায়। নিশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে তার। নিজের জানাচেনা পৃথিবীকে হারিয়ে কোথায় চলেছে সে? সে কি মৃত? মরে গিয়ে স্বর্গের দিকে? আর ফিরতে পারবে না নিজের বাড়িতে, এঁদো পুকুরে, ভাঙা চালায়, ধুলোর রাস্তায়, ধানের মাঠে, ইস্কুলে, আটচালায়, সোম-শুক্রর হাটে, খেলার মাঠে, হাডুডুর যুদ্ধে, ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতায়? ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনি তার সর্বাঙ্গে। এই উড়ে-চলা মোটর বাইক আর এই রঙে রঙে অনির্বচনীয় মহাশূন্য থেকে এক লাফে নিজের পরিচিত পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে তার। ভয়ার্ত তুখির মনের মধ্যে যখন এই-রকম ইচ্ছের তোলপাড়, তখনই তার মোটর বাইক নেমে আসে বাস্তব-তার ডাঙায়। দিগন্তবিস্তৃত রেললাইন। তুখির মোটর বাইক ছুটে চলেছে তারই ওপর দিয়ে। আর পিছন থেকে তার কানে আসে চলন্ত রেলগাড়ির মাটি কাঁপানো শব্দ। তুখির ক্ষমতা নেই নিজের লাইন থেকে সরে যাওয়ার। তাহলে? তাহলে তো এখুনি তাকে এই রেল লাইনের উপরেই চিঁড়ের মত চ্যাপ্টা করে দিয়ে চলে যাবে পিছনের

রেলগাড়ি? পিছনের আওয়াজ ক্রমশ প্রবলতর। ফুখি ভয়ে চোখ বোজে। একটু পরেই তাকে চোখ খুলে তাকাতে হয় নিজের ডানদিকে। আর পিছনে নয়, শব্দটা চলে এসেছে তার পাশে, ডানদিকে। তাকিয়েই অবাক হয়ে যায় সে। রতন মাইতি তার মোটর বাইকে। আর রতন মাইতির কোমর জড়িয়ে এক পরমাসুন্দরী। ফুখি পরমাসুন্দরীর দিকে তাকায় না। রতন মাইতিকেই শুধু দেখে নেয় এক ঝলক। মাথায় কালো টুপি। চোখে জামবাটির মত গোল কালো চশমা। গায়ে কালো রঙের শার্ট। প্যান্টের রঙটাও কুচকুচে কালো। দু-হাতে দুটো কালো দস্তানা।

খানিক আগে মৃত্যুর ভয়ে শিউরে উঠেছিল সে। এখন রতন মাইতিকে তার মনে হল মৃত্যুদূত। ঢাকের উপর কাঠের বদলে হাতের চাপড় মারলে যেমন শব্দ হয়, ফুখির হৃৎপিণ্ডের শব্দটা সেই রকমই। সে পালাতে চায়। নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলবে রতন মাইতি তাড়া করে চলেছে তাকে।

সে পালাতে চাওয়া মাত্রই রতন মাইতির মোটর বাইককে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় তার মোটর বাইক। কিন্তু একটু পরেই রতন মাইতির মোটর বাইক ঠিক তার পাশে। মরণাপন্ন যেভাবে বাঁচতে চায়, সেই তীব্র আকুতির চাপে ফুখির মোটর বাইকের গতিবেগ বেড়ে যায় আবার। সে রতন মাইতিকে পিছনে ফেলে অনেকদূর। কিন্তু খানিক পরেই আবার তার সমান্তরালে রতন মাইতির মোটর বাইক। এই রকম এক অঘোষিত প্রতিযোগিতার মধ্যে জড়িয়ে হঠাৎ ফুখির মনের ভাবনা বাঁক নেয় অন্যদিকে। তাকে জিততে হবে। সে জেতার রাস্তা খোঁজে। রতন মাইতির দিকে না তাকিয়ে সে তাকায় পিছনের পরমাসুন্দরীর দিকে।

চেনা-চেনা লাগে মুখটাকে। নহাটির বাজারে দেওয়ালে-দেওয়ালে ছয়লাপ সিনেমার পোস্টারে প্রজাপতি রঙের যে-সব হিরোইনের মুখ, তাদেরই মত। লাল ঠোঁট আর কপালের লাল টিপে গোটা মুখটা জলজ্বলে। যাত্রাদলের পরচুলার মত ঘাড় পর্যন্ত চুল বাতাসে উড়ে উড়ে

থেকে থেকেই ঢেকে দিচ্ছে তার মুখ। এই অপ্সরীর কাছে রতন মাইতি আর তার বাপের মুখোশটাকে খুলে দিতে হবে। ঘুখি জিভটাকে শানিয়ে নেয়।

—যার মুটোর বাইকে চেপে যাচ্ছ, তাকে চিনো?

অপ্সরী নিজের চুল সামলাতে ব্যস্ত। তা ছাড়া ঘুখি কথা বলছে দেখেই হয়ত হঠাৎ রতন মাইতির মোটর বাইকের শব্দটা বেড়ে যায় আরও। অপ্সরীর কানে ঢোকেনি তার কথা। সে জোর বাড়ায় গলায়। —উনি খুনের ব্যাপারে ফেঁসে আছেন। ওনার যে বাপ, তিনি আরও গলাকাটা। তেনার রেশনের দোকানে···

ঘুখির কথা শেষ হওয়ার আগেই রতন মাইতির মোটর বাইক তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে। প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তির চাপে ঘুখির মোটর বাইক আবার তার পাশাপাশি।

—গত মাসে কেরোসিন পায়নি মোদের গেরামে। চিনি পায়নি। চালে বেড়াল-পচা ঘুগ্যান্ধো।

দৃশ্যের ভিতরে আচমকা ঢুকে পড়ে একটা সিনেমা হল। রতন মাইতির মোটর বাইক সেদিকে বেঁকেই অদৃশ্য। আর তখুনি সে আবার মহাশূন্যে। এবারে মহাশূন্যটা অন্যরকম। মেঘ নেই, রঙ নেই, সমস্তটা ছানি-পড়া চোখের মত ফ্যাকাশে। দূরে কেবল একটা লাল আভা দপ্‌দপ্‌ করছে রক্তচক্ষু জ্বালিয়ে। তার মোটর বাইক সেই লালের দিকে। লাল ক্রমশ তীব্রতর। জমাট নয়, লেলিহান। মহাশূন্যের হাওয়ায় তার তাপ। ঘুখির গায়ে লাগে গরম হাওয়ার ঝলক আরও এগলে আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে দৃশ্যটা। প্রকাণ্ড মাপের একটা গোল চাকা ঝুলে আছে শূন্যে। লকলকে আগুনের হাজার হাজার শিখা তাকে জড়িয়ে পাকে পাকে। গায়ে আগুনে-হাওয়ার ঝাপটা সত্ত্বেও তার রক্ত ঠাণ্ডা বরফ। প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তিতেও সে উল্টোদিকে ঘোরাতে পারে না তার মোটর বাইকের মুখ। আতঙ্কে দিশেহারা সে যখন ঐ বিশাল অগ্নিবলয়ের দিকে এগতে এগতে মৃতের মত স্পন্দনহীন,

তখনই তাকে চাবুক মেরে চমকে দিয়েই যেন, তার ছুটে চলার আগুনে-পথের দুপাশে ফুটে উঠতে থাকে চেনা সব মানুষ। চোখ জ্বলে যাচ্ছে। তবু অনেককেই চিনতে পারে সে। তার মাসতুতো ভাইবোন, পোরে, ননী, তারক, মাখন ছাড়াও তার স্কুলের আরও সবাই, পাড়া-পড়শি দুখির ভাইবোন, নহাটির হাটের লোকেরাও। দুখির সার্কাসের খেলা বা মোটর বাইকসহ তার অগ্নিঝাঁপ দেখার জন্যে সকলের চোখে মুখে হাসি, কৌতুক, আর উদ্বিগ্ন অপেক্ষা। দুখি চিৎকার করে কিছু বলতে চায়। কিন্তু তার কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ। ঠিক তখনি তার কানে আসে মায়ের তীক্ষ্ণস্বর —পোড়ারমুখো, ঢেঁকিটাকে ভাঙবি নাকি তুই? ঢেঁকি গেলে মুখে পাঁশ জুটবে কোত্থেকে?

মায়ের মুখটাকে দেখার জন্যে দুখির মধ্যে আকুলি-বিকুলি। কিন্তু তার চোখ তখন পুড়ে যাচ্ছে আগুনের ছোবলে ছোবলে।

তুঁতে নীল খামগুলি

—বাবা-আ-আ।

—কে ?

—আমরা।

—সুজিত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছোট মাসী এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

—ছোট মাসী মানে ? শিবানী ? তাই নাকি ? কই সে ?

তিনটে নরম বালিশে হেলান দেওয়া নিশীথবাবু নড়ে-চড়ে ওঠেন নিজের বিছানায়। হাতদুটো প্রার্থনার ভঙ্গিতে জড়ো করা ছিল। ড্যুরার বা রদাঁর প্রার্থনার হাতের মতই অনেকটা। ঘরে রোদ নেই। আলো বাইরে। সেকেলে বাড়ি। তাই জানলা লম্বা। জানলার কাচে কাচে প্রতিফলিত হয়ে ঘর কিছুটা আলোকিত। কিছু চৌকো আলো নিশীথ-বাবুর বিছানার চাদরে। আলোটা আসছে কোনো ঝিরঝিরে গাছের পাতা ছুঁয়ে। তাই সেই চৌকো আলোর ভিতরে রয়ে গেছে ঝিরঝিরে পাতাদের থরোথরো কাঁপুনিময় আবছা ছায়া।

—এই তো জামাইবাবু।

—বোসো।

শিবানী নিশীথবাবুর বিছানায় বসে পা বাইরে ঝুলিয়ে। হাতের প্রার্থনা-ভঙ্গি ভেঙে নিশীথবাবু ডান হাতটা বাড়িয়ে দেন শিবানীর দিকে। ত্রিশূল ফলার মত শীর্ণ অথচ ধারালো আঙুলগুলো শিবানীর উরুর কাছাকাছি পৌঁছলে শিবানীই ধরে ফেলে হাতটা। নিজের হাতের তালুতে রাখে।

—কখন এলে শিবানী? কোথা থেকে এলে? কবে এলে?

—কলকাতায় এসেছি পরশু।

—এমনি? বেড়াতে?

—না। আমার ছোট দেওরের বড় মেয়ের বিয়ে।

—অঃ। থাকবে অনেকদিন?

—না। সপ্তাহখানেক থাকব হয়ত।

—একা এসেছ?

—না। সমীরও এসেছে।

—এখানে এসেছে?

—না। এখানে আসে নি।

—সুজিত আছে?

—না, চলে গেছে।

—অঃ। তুমি কি পাবে? পাবে কিনা দেখ তো। আমার চশমাটা।

—কোথায় রেখেছেন?

—অল্প একটু পড়ার চেষ্টা করেছিলুম খানিক আগে। দেখ তো একটা ছোট্ট টেবিলের উপর যে বইগুলো, তার পাশে কিনা।

শিবানী নিশীথবাবুর হাত বিছানায় নামিয়ে চশমা খোঁজে। নিশীথ-বাবুও খোঁজেন। বিছানায়, বালিশের এদিক-সেদিক।

—পেলে?

—না। এখানে নেই।

—পেয়েছি, পেয়েছি। নিজেই রেখেছি বালিশের ভিতরে ঢুকিয়ে।

খাপ থেকে খুলে নিশীথবাবু চশমাটা পরেন। ভীষণ পুরু লেন্সের চশমা। ভারী। ওটা পরলে যৎসামান্য বাড়ে দেখার ক্ষমতা। পরে, একেবারে নাকের ডগায় বই এনে পড়তে পারেন মোটামুটি।

—তুমি আমার দিকে আরও একটু সরে এস শিবানী। নইলে দেখতে পাব না তোমাকে।

শিবানী বিছানা ঘস্‌টে এগিয়ে আসে। খাট কাঁপে। নিশীথবাবুও দুলে ওঠেন।

—এখনও দিনের আলো আছে বলেই তোমাকে অল্প অল্প দেখতে পাচ্ছি। রাত্রে হলে চিনতে পারতুম না। মনে হত দরজা বা জানলার পর্দার মত কিছু একটা ঝুলে আছে সামনে। তুমি কি বেশ মোটা হয়েছ?

শিবানীর সলজ্জ হাসি নিশীথবাবুর চোখে পড়ার নয়। তাই উত্তর দিতে হয় শিবানীকে।

—একটু।

—একটু তো নয়। বেশ ভরাট গিন্নিবান্নিই তো বানিয়েছ নিজেকে। কত বছর পরে দেখা হল আমাদের? শেষ কবে দেখেছি তোমাকে?

—সুজয়ের বিয়েতে এসেছিলুম।

—সুজয়ের বিয়ে। তার মানে নাইনটিন সেভেনটি নাইন। কত বছর হল?

—বছর আটেকের মত।

—তাই নাকি? এত বছর পরে? তা হবে। আজকাল সময় বড় দ্রুত চলে যায়। দ্রুত চলে যাওয়ার মত হালকাও হয়ে গেছে এখনকার সময়। তুমি কি তোমার দিদির মত মোটা হয়েছ?

—না। অত মোটা নই।

—তোমার দিদি হঠাৎ কিভাবে অসম্ভব মুটিয়ে গেলেন বল তো। আমারও অবাক লেগেছে। অথচ বিয়ের সময়, তুমি তো দেখেছ। তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা। আমি তো ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরতে পারতুম না আর। লরেল-হার্ডির মতো কনট্রাস্ট।

নিশীথবাবু হাসেন। জল দিয়ে কুলকুচির মত গলার ভিতরে আটকানো হাসি।

—সুজয়ের বিয়ের সময়ও মোটা ছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—পরে আরও মোটা হয়েছিলেন।

নিশীথবাবু থেমে কি যেন ভাবেন। চোখ থেকে খুলে নেন চশমাটা। পেটের গৈরিক পাঞ্জাবীর উপর রাখেন। বিছানার চৌকো রোদ নিশীথ-বাবুর দিকে সরে গেছে অনেকটা।

—তুমি একটা চেয়ারে বসো না মিতুল।

নিশীথবাবুর বন্ধ চোখ দুটো খুলে যায়।

—কাকে বসতে বললে তুমি?

—আমার দেওরের মেয়ে। আপনাকে দেখার খুব শখ।

—কই সে?

নিশীথবাবু শরীরটাকে বাঁদিকে ঘোরান। দুহাতে পেটের উপর থেকে চশমা তুলে নিয়ে চোখে লাগান।

—কই, মিতুল কই?

—এগিয়ে যাও, মিতুল। বসো না মেসোমশায়ের পাশে।

মিতুল বসে। নিশীথবাবু তাঁর আধশোয়া শরীরটাকে খানিকটা সোজা করে মিতুলের দিকে ঝুঁকে দেখেন। হাত রাখেন মাথায়, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। চিবুক ছোঁন পরে।

—কি পড়ছ তুমি?

—বি এ পার্ট ওয়ান দেব এবার।

—বোসো, তোমার সঙ্গে কথা বলব।

নিশীথ আবার আধশোয়া হন। চশমাটা খুলে বুকে। অল্প একটু স্তব্ধতার পর

—তোমাকে একটু আগে বললুম না শিবানী, তোমার দিদির হঠাৎ মোটা হয়ে যাওয়ার কথা। উনি কিন্তু হঠাৎ মোটা হন নি। মোটা হতে

শুরু করলেন লাইগেশানটা করানোর পর। ওঁর ভয় ছিল, আপত্তি ছিল। ঐ মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়। এখন বুঝতে পারি, অনুতাপ হয়, কাজটা করানো উচিত হয় নি আমার। উচিত ছিল আমারই অপারেশনটা করিয়ে নেওয়া। খুবই মাইনর অপারেশন। কিন্তু পারি নি। ঠিক যে ভয়ে তা নয়। সঙ্কোচে। লজ্জায়। নিজের খ্যাতির উপর বড় মোহ ছিল তখন। অথচ···

— মিতুল, তুমি ভিতরে যাও।

— কেন, ওকে চলে যেতে বলছ কেন? ওর সামনে এসব কথা বলছি বলে? এতো চিকিৎসা-বিজ্ঞান! এতো সেক্স নিয়ে আলোচনা নয়। তাছাড়া আমাদের সময়ের চেয়ে এখনকার এরা অনেক অ্যাডভান্স। ওরা পারমিসিভ সোশাইটি পেয়ে গেছে। পারমিসিভ সোশাইটি গড়তে হয় নি। খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন, পত্রপত্রিকা, টিভি গড়ে দিয়েছে।

নিশীথবাবু একটু থামেন। তাঁর একাত্তর বছরের প্রাজ্ঞ মুখাবয়ব এখন অস্থিপ্রধান। ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার, মুষ্টিমেয় পুরোধা বুদ্ধিজীবীদের একজন তিনি। জীবিকার জীবন শুরু করেছিলেন সাংবাদিকতা দিয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ সম্মানে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাস করার পর। পরে হয়েছেন ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক। উত্তাল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের আদি লগ্নে গান্ধীজীর অনুগামী। পরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া। সেই সূত্রে দীর্ঘ কারাবাস। জেল থেকে বেরলেন, মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে। মার্কসবাদী হওয়ার অপরাধে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র থেকে ছাঁটাই। তখন সাহিত্যকর্মই জীবিকা। এবং পার্টির হোলটাইম ওয়ার্কার, শ্রমিক ইউনিয়নে। পরে আবার জেল। সেখানেই শরীর ভাঙে হাঙ্গার স্ট্রাইকে। মাত্র ছ'বছর আগে পেয়েছেন আকাদেমি পুরস্কার। তাঁর পাওনার তুলনায় নগণ্য। মার্কসবাদী না হলে জুটে যেত আরও একাধিক সম্মান। যথাযোগ্য সম্মানিত না-হওয়ার বেদনাবিক্ষোভ বয়ে বেড়ায় তাঁর অনুগামীরাই। তিনি ভ্রূক্ষেপহীন। আমি তো পুরস্কার পাওয়ার

জন্যে লিখি না। লিখি আমার দায় থেকে। অবশ্যপালনীয় দায়। এভাবেই উত্তর দেন তিনি।

এখন, এই মুহূর্তে ইয়ুং মনে এসে যাচ্ছিল তাঁর। যে আলোচনার ইঙ্গিত ছুঁড়েছেন একটু আগে, সেটা বিশদ করতে না পারলে যেন দায়িত্ব এড়ানো হবে, এই রকম মনোভঙ্গি থেকেই ফিরে আসেন তিনি নিজের কথায়।

—দোষটা আমাদেরই। আমরাই পারি নি আমাদের সাহিত্যচর্চা বা বুদ্ধির চর্চাকে বিজ্ঞানের খাতে বহাতে। নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে উপন্যাস গল্প লেখা হয়েছে যে সব, লেখা এখনও হচ্ছে যা, তাঁরা মোমের নরনারী। বাস্তবের নরনারী নয়, ইউটোপিয়ার। তুমি তো দেখেছ শিবানী, আমাদের সময়ে বিদেশ থেকে পুতুল আসত এক রকমের যাদের হাত পা মুড়ে দেওয়া যায়। মাথাটাকে নাড়ালে চমৎকার নীল চোখ এদিকে-ওদিকে ঘোরে। আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ নরনারী ঐ রকমের ডলি পুতুল। লেখকের বানানো।

—লেখকই তো বানাবে।

—কথাটা কে বললে শিবানী? তুমি?

—না। মিতুল।

—মিতুল? ঠিকই প্রশ্ন করেছ তুমি। লেখকই তো বানাবে তাদের সাহিত্যের নরনারী। এ তো বেশ বুদ্ধিমতী, ইনটেলিজেন্ট। তোমার ছোট মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গেছে? তাই না?

—হ্যাঁ, অনেকদিন। আপনি তখন লক্ষ্ণৌ-এ। লিটেরারি কনফারেন্সে। তাই আসতে পারলেন না। দিদি, সুজিত, সুজয়, সুমিত্রা, ওরা সবাই গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তোমার দুই মেয়ে। আর এক ছেলে। ছেলেই তো বড়। সে এখন কোথায়? আগে তো জানতাম ক্যালিফোর্নিয়ায়।

—এখন কানাডায়। ক্যানসার নিয়ে রিসার্চ করছে। নামও হয়েছে খুব।

—আসে মাঝে মাঝে? দেখা হয় তোমাদের?

—বছর তিনেক আগে এসেছিল। আমি গিয়েছিলাম গত বছর। ওর ছোট মেয়ের অন্নপ্রাশনে।

—এটা একটা অদ্ভুত লক্ষণ। এ নিউ ফেনমেনা। আমাদের দেশের ছেলেরা আমাদের দেশের বাইরে গিয়ে সাইন করছে অনেক বেশি। সায়েন্স বা টেকনোলজির বেলায় এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই বা বলি কেন? ইকনমিক্স বা সোশ্যাল সায়েন্সেও তো আমাদের দেশের ছেলেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ইউরোপে, আমেরিকায়। মিতুল!

—আজ্ঞে।

নিশীথবাবু ঘুরে তাকান মিতুলের দিকে। চশমা না পরেই। ফলে মিতুলের মুখ তাঁর চোখে ঝাপসা এক অবয়ব মাত্র। ইমপ্রেসনিস্টরা যেভাবে ধরতে চেয়েছিল মুহূর্তের মূর্তিকে, সে রকম বর্ণোজ্জ্বলও নয়। আবার কিউবিস্টরা যেভাবে বস্তুর অবয়বকে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দিয়েছিল শতটুকরোয়, সাজানোও নয় তেমন। বরং ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণের সময়কার ওয়াশের কাজের মত। ধূসর রঙিন।

—তুমি যেখানে বসে আছ তার পাশে বইয়ের যে র‍্যাক, একটু খুঁজলেই সেখানে পেয়ে যাবে একটা বই। টলস্টয়। পেপারব্যাক। লেখক হেনরী ট্রোয়াট। দেখ তো, পাও কিনা বইটা।

অল্প কয়েকটা বই নাড়াচাড়া করেই মিতুল পেয়ে যায় বইটা। নিশীথবাবুকে দিলে তিনি বইটা হাতে নিয়ে খোলেন না। বুকের উপরে রাখেন।

—এই বইটা আগে পড়িনি, এখন পড়ছি।

—পড়তে পারেন? তবে যে সুজিত বলছিল, বই পড়তে বা লিখতে পারছেন না একেবারে?

শিবানীর প্রশ্নের ঝাপটা লাগে নিশীথবাবুর চোখে। তিনি চোখ বুজিয়ে মৃদু হাসেন। শিবানী প্রশ্নটা না তুলে পারছিল না। জামাইবাবু প্রায় দৃষ্টিহীন, বহুদিন ধরে শুনে শুনে সে আজ আশা করেছিল দেখবে

পচা মাছের মত পাঁশুটে চোখ। কিন্তু দেখল একটু অদল-বদল হয় নি চোখের রঙের। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার বয়সে এই চোখের মধ্যেই সে প্রথম দেখতে পেয়েছিল ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিতেজ। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া জামাইবাবুও তখন এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যেন। তখনও বিয়ে হয় নি তার। এসেছিল দিদির সংসারে কলকাতায় কয়েকমাসের জন্যে। তখনই অগ্নিপুরুষ জামাইবাবুকে সজ্ঞানে জানা। দ্বিতীয়বার জেল থেকে বেরনোর পর হাঙ্গার স্ট্রাইকে শরীর ভাঙার খবর পেয়ে ওড়িশায় থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন শ্বশুরমশায়, স্বাস্থ্যোদ্ধারের সুবিধার্থে। তখন জামাইবাবু ছিল শিবানীরই হেপাজতে। দক্ষ নার্সিং-এ দুমাসেই সে রঙ ফিরিয়ে দিয়েছিল জামাইবাবুর রক্ত-মাংসের। নেভানো চোখে আবার ফিরে এসেছিল আগুন। তার গনগনে আঁচে পুড়ে গিয়েছিল শিবানীর শরীর এবং মনও। পুড়ে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছিল সে। শিবানীর কুমারী জীবনে প্রথম ভালবাসার পুরুষ হয়ে ওঠার দিনগুলোয় জামাইবাবু মাঝে মাঝে অন্ধ সাজতেন ইচ্ছে করে। শিবানীকেই বলতেন, এটা পড়ে শোনাও, ওটা পড়ে শোনাও।

মুখের হাসিটাকে ক্রমশ চওড়া করে নিশীথবাবু বললেন,

—রাজা কর্ণেন পশ্যন্তি, এটা একটা সংস্কৃত বচন। আমার সংস্কৃতি-চর্চাও এখন পরের মুখের শোনা কথায়। কান দিয়ে দেখা এবং পড়া। রোজ সকাল নটায় একটি মেয়ে এসে আমার কাজ করে দিয়ে যায় বারোটা পর্যন্ত। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে। কাজ মানে প্রধানত দুটো। আমার লেখালেখির ডিকটেশন। আর বই পড়ে শোনানো। ঐ বারোটা পর্যন্তই আমাকে বলতে পারো চক্ষুষ্মান। তারপর দিনের বাকি সময়টা প্রায়ান্ধ। মিতুল আছো?

—হ্যাঁ, বলুন।

—এই বইটা এখন আমি পড়ছি। এর এক জায়গায় আছে 'আনা কারেনিনা'-র কথা। তুমি পড়েছ 'আনা কারেনিনা'?

—না।

—পড়বে। এসব এপিক পড়া দরকার। জীবনের বোধ বিস্তার পায়। টলস্টয় যখন এই উপন্যাসের প্রথম খসড়া করেন, তখন আনা ছিল অন্যরকম। টলস্টয় তখন সেনসুয়ালিটির বিরুদ্ধে। সেক্স অ্যাক্টকে মনে করতেন দেহের পাপ। 'সিন অফ দ্য বডি'। আনা চরিত্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল ঘৃণা। প্রথম খসড়ায় তাকে বানালেন কুরূপা। তাকে নিয়ে যে চ্যাপটার, নাম দিলেন 'দি ডেভিল'। কিন্তু পরের পরের খসড়ায় ক্রমশ বদলে যেতে লাগল সে। ক্রমশই রূপসী হয়ে উঠল আনা। এখন বল তো, লেখকই যদি লেখে, তাহলে আনাকে কুরূপা থেকে রূপসী করতে কেন বাধ্য হলেন টলস্টয়?

মিতুল মুখ টিপে হেসে একবার শিবানীর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে মাথা নুইয়ে রাখে।

—অবৈধ প্রণয় শাসন করবেন, এই ভেবেই শুরু করেছিলেন আনা কারেনিনা। শাসন করলেনও আনাকে ট্রেনের চাকার তলায় ফেলে। কিন্তু কিছুতেই পারলেন না অবৈধ প্রণয়কে নিজের ভিতরকার প্রবল বিদ্বেষের আলকাতরার রঙে কালো করে দিতে। অবৈধ প্রণয়কেও তাঁকে যোগাতে হল প্রাপ্য সুবর্ণকান্তি। পারলেন না, যেহেতু অবৈধ প্রণয়ের নির্মম আক্রমণকারী হয়েও অবৈধ প্রণয়ের সামাজিক অস্তিত্ব, অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দুটোর কোনোটার প্রতিই অসৎ হওয়ার ক্ষমতা ছিল না তার। আসলে কি জান, সাহিত্যও ইতিহাস। ইতিহাসই লেখককে দিয়ে লেখায়, লেখাতে বাধ্য করে—মিতুল শুনছো?

—মিতুল নেই।

—নেই? এই তো ছিল।

—উঠে গেল।

—উঠে গেল, না তুমিই ওকে চোখের ইশারায় সরিয়ে দিলে? একাত্তর বছরের বৃদ্ধের মুখে পারভারশনের ফুলঝুরি ফুটছে দেখে? তাই না?

স্তব্ধতা গাঢ়তর হয়। নিশীথবাবু বুকের উপর থেকে নামিয়ে রাখেন টলস্টয়। চৌকো আলো এখন তাঁর বুকে। আলোর মধ্যে থরথরিয়ে কাঁপা কচিপাতার পাতলা ছায়া নিশীথবাবুর বুকের ভিতরের কোনও অস্থির আলোড়নের প্রতীক এখন।

—একজন লেখকের মত পাপী মানুষ আর হয় না শিবানী।

—জামাইবাবু-উ-উ।

—বলো।

—অন্য কথা বলুন। এসব থাক।

—গোপন করতে করতে, একজন লেখকের হৃদয় মরার আগেই হয়ে যায় মৃত্যুর কফিন। একজন লেখকের চেয়ে আর কে বেশি হত্যাকারী? কত জ্যান্ত সত্যকেই না শেষ পর্যন্ত গলা টিপে মেরে রেখে যেতে হয় তাকে।

—জামাইবাবু, প্লিজ অন্য কথা বলুন।

নিশীথবাবুর ডান হাতটা নড়ে ওঠে। কাঁপে। তারপর গহ্বর থেকে বেরনো সাপের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় শিবানীর হাতের দিকে। শিবানীর হাতটাকে মৃদু চাপে নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নেন। শিবানীর উষ্ণ হাতে ফ্রীজের ঠাণ্ডার ছেঁকা লাগে যেন।

—অন্য কথাও বলব শিবানী। তোমার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না। যে কথাগুলো শুধুমাত্র তোমাকে জানাবার, সেগুলো না জানালে শান্তি পাব না আমি।

এই প্রথম শিবানীর চেতনায় ভয়ের মত কিছু একটার নড়াচড়া।

—কি জানাবেন?

—যে কথাগুলো পৃথিবীর কেউ জানবে না কোনোদিন। আমি মার্কসবাদী। আমি বিজ্ঞান জানি। ডায়ালেকটিক্স জানি। যে কোনো ঘটনার কার্যকারণ জানি। সেই আমি তো পারলাম না সত্যের সবটুকু উদ্‌ঘাটন করে যেতে। পিছিয়ে, শিউরে, সরে এলাম। ভারতবর্ষের জল-

হাওয়ায় আমার শ্রদ্ধেয় চরিত্রের উপর নর্দমার কাদা ছিটকে পড়বে, এই ভয়েই তো ?

—সত্যি জামাইবাবু, এটা কিন্তু ভীষণ অন্যায়, অন্যায় করছেন আপনি। এত বছর পরে দেখা করতে এলাম। কোথায় গল্প করবেন আমার সঙ্গে। তা নয়, শুরু করলেন ফিলজফি।

—একটু বলতে দাও আমায় শিবানী। অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে আমাদের চিন্তায়। সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম-কে চিরকাল ভুল ইণ্টারপ্রেট করে এলাম আমরা। রিয়ালিজম বলতে বুঝলাম সুপার স্ট্রাকচারের আলোড়ন শুধু। আইসবার্গের উপরটুকুই শুধু। যে অংশটা জলের তলায় তা যে আরও ভয়াবহ, তার সঙ্গেও যে আসল যুদ্ধ-বিরোধ, সেসব মনে পড়েনি আমাদের।

—এসব কথা আমাকে শুনিয়ে কি লাভ হচ্ছে আপনার ? আমি কি বুঝব এসব ? না লিখব এসব নিয়ে ?

—আমার প্রথম উপন্যাসের প্রথম পাঠিকা ছিলে তুমি, সেটা প্রথম উপন্যাসের উৎসর্গপত্রেই লেখা আছে। লোকে জানে বা জেনে যাবে। কিন্তু তুমিই যে আমাকে দিয়ে লেখালে প্রথম উপন্যাস, সে কথা তো কাউকে জানিয়ে যেতে পারলাম না শিবানী। তোমাকে তোমার যোগ্য এবং পাওনা সম্মান এখনও দেওয়া হয় নি আমার।

—কি ছেলেমানুষি করছেন এসব বলে।

—তারিখের হিসেবে, মাত্র দু'মাস। কিন্তু ঐ দু'মাসের ভাল-বাসাতেই একজন কট্টর পলিটিক্যাল মানুষের পাঁজরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গোপন ঝর্ণার জলধ্বনিকে দিয়েছিলে চিনিয়ে। যে জলস্রোত বরফ হয়ে যাচ্ছিল শুকিয়ে তাকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত প্রাণপ্রাচুর্যে জেগে ওঠার উত্তাপ যুগিয়েছিলে তুমিই। কী অপূর্ব সব চিঠি লিখতে তুমি তখন। সে সব মনে আছে তোমার ? শিবানী।

—আপনি মনে রেখেছেন এখনও ?

—শুধু মনে রাখব কেন, চিঠিগুলোও তো রেখেছি ?

—আমার চিঠিগুলো ?

—হ্যাঁ, তোমার তুঁতে নীল কাগজে লেখা চিঠিগুলো।

—সে কি ? কেন রেখেছেন ? কি হবে রেখে ?

—ইতিহাসের উপকরণ। সভ্যতার নয়, আমার জীবনের।

২

—টলটস্টয়ের বাকি অংশটা পড়ব কি ?

—না। টলস্টয় থাক। তোমাকে একটা অন্য কাজ করতে হবে বীথি।

—বলুন।

—পাশের ঘরে যাও। আলো জ্বালবে। ঘরটা একটু অন্ধকার। পারলে জানলাটাও খুলবে। ও তুমি তো অনেকবারই গেছ ও ঘরে। তাহলে তো জানোই। বইয়ের র‍্যাকগুলোর মাঝখানে কয়েকটা খুপরী আছে চাবি দেওয়া। ওরই কোনো একটা খুপরি খুলতে হবে তোমাকে। আসলে সবগুলো খুলেই দেখতে হবে, কোন্‌টায় রয়েছে একটা সবুজ রঙের কভার ফাইল। ফাইলটা চিনতে পারবে, উপরে লেখা 'পার্সোনাল'। ঐ ফাইলটা আমার দরকার।

বীথি ফাইল খুঁজতে চলে যায়। নিশীথবাবু বাঁহাতে চশমার খাপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একসময় খাপটাকে মুখের উপরে এনে চশমাটা বের করে চোখে লাগান। যেন প্রস্তুতিপর্ব। ফাইলটা এলে, যা খুঁজছেন ফাইল থেকে সেগুলো পড়ার।

নিশীথবাবু এখন ঘরের বিছানায় নন। দোতলার বারান্দায়, ইজিচেয়ারে। তাকালেই আকাশ। আকাশের নিচে কলকাতার স্কাই-লাইন। চোখ নামালে বারান্দার টবে বটল পাম। বাতাসে দুলছে তাদের সরু সরু চিকন পাতার ঝালর। তিনি ভারতবর্ষের আকাশের দিকে তাকিয়ে। কোনো রঙ নেই এখন যেখানে। আলো আছে। কিন্তু নিশীথবাবুর জিজ্ঞাসার অন্ধকারে পৌঁছবার আলো নয় তা। হ্যাঁ

জিজ্ঞাসার অন্ধকারই। কারণ জিজ্ঞাসাটাও খুব স্পষ্ট নয় তাঁর কাছে। শুধু জানেন শিবানীকে ঘিরে জিজ্ঞাসা। সামান্যই জিজ্ঞাসা। বিয়ের আগের কুমারী জীবনটাকে সে একেবারে ভুলে বাতিল করে দিতে পারল কি করে? সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার বিশাল গরজে মেয়েদের কি বাধ্যতামূলকভাবেই শিখতে হয় এই বিস্মরণ? কিন্তু শুধু মেয়েদের উপর দোষ চাপিয়েই বা কী হবে? আমরা পুরুষরাও কি কখনও সাহস করে স্বীকৃতি দিতে পেরেছি আমাদের সাহিত্যে তথাকথিত সামাজিকতা-বিরোধী প্রেম ভালবাসাকে। বাংলা সাহিত্য প্রধানত পুরুষেরই সাহিত্য। এক অর্থে শ্রেণী সাহিত্য। রামায়ণ-মহাভারতেও তাই। তা না হলে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয় কেন সীতাকেই শুধু? বহুবিবাহে পারদর্শী রাজপুরুষদের তো পরীক্ষা দেওয়ার দায় নেই কোনো? আসলে বাংলা সাহিত্যে প্রেম নেই। প্রেমের নামে যা তা মহিলাদেরই পাপ এবং প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী। 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথও পারলেন না বিনোদিনীকে তার কামনা-বাসনার নিজস্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে দিতে। 'চতুরঙ্গ'-এ এগিয়ে এসে-ছিলেন অনেকখানি। এই প্রথম একজন নারী সমাজের অন্ধ নীতি-নিয়মের চেয়ে ব্যক্তিজীবনের চরিতার্থতার সম্পূর্ণতার স্বাদ পেতে বিদ্রোহিনীর বর্ণোজ্জ্বল সাজে সাজিয়েছিল নিজেকে, বৈধব্য-বসন ছিঁড়ে। কিন্তু সেও দু'টুকরো হয়ে গেল দ্বিধায়।

—এটা কি?

ফিকে হয়ে যাওয়া সবুজ ফাইলটা বীথির হাত থেকে নিয়ে ঝুঁকে দেখলেন নিশীথবাবু 'পার্সোনাল' কথাটা লেখা আছে কিনা।

—হ্যাঁ, এটাই। তুমি বোসো বীথি।

বীথি বসলে ফাইলটা এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

—এটা খোলো। এর মধ্যে চিঠি আছে অনেকগুলো। সব চিঠি দেখার দরকার নেই। তুঁতে নীল রঙের খামের চিঠিগুলোই একটু দেখব আমি।

বীথি ফাইল খুলে তুঁতে নীল রঙের চিঠি খোঁজে অজস্র চিঠির ভিতর থেকে।

—এটা কি ?

—দেখি দাও।

—না, এর মধ্যে কোনো চিঠি নেই কিন্তু। শুধু একটা ছবি।

—ছবি ?

—ছবি মানে ফোটোগ্রাফ।

—ফোটোগ্রাফ ? কই দেখি।

খামের ভিতর থেকে অল্প একটু বের করা ফোটোগ্রাফটা খামশুদ্ধ নিশীথবাবুর দিকে এগিয়ে দেয় বীথি। নিশীথবাবু ফোটোগ্রাফটা বের করে নাকের কাছে এনে দেখেন। কোনারক। কোনারকের সূর্যমন্দিরের দোতলায় দাঁড়িয়ে তিনি আর শিবানী। কে তুলেছিল ছবিটা ? সুহাস ? তার শ্যালক ? হ্যা, সুহাসই। ফোটো তোলার হবি ছিল তার। সুহাস সে সময় অনেক ছবি তুলেছিল তাঁর। সুহাস না তুললে তাঁর যৌবনকালের কোনো ছবিই থাকত না আর। শিবানীর মুখে সূর্যের আলো-লাগা হাসি। তিনি শিবানীকে জড়িয়ে। শিবানীও তাঁকে। তাঁদের দু-পাশে দুই নৃত্য-ভঙ্গিমার বাদিকা। কোনারকের সূর্যমন্দিরে এখনও তারা আছে। থাকবেও তারা। বালির ঝড়ে ক্ষয়ে যেতে যেতেও থেকে যাবে শাশ্বতকাল। কিন্তু তিনি আর শিবানী ক্রমরূপান্তরিত হতে হতে থাকবেন না আর একদিন। তাঁদের কারও না থাকার পর ছবির এই মুহূর্তটাও তো আবার হয়ে যাবে শাশ্বতকালের। বীথির দিকে ঘুরে মৃদু হেসে ফোটোগ্রাফটা এগিয়ে দেন।

—দেখ তো চিনতে পারো কিনা কাউকে ?

বীথি নিবিড় চোখে দেখে।

—মেয়েটিকে অবশ্য চেনার কথা নয় তোমার। দেখনি কখনো। কাল এসেছিলেন আমাকে দেখতে। তার পাশের লোকটিকে দেখেছ তুমি।

— দেখেছি আমি ?

— হ্যাঁ, অল্প কিছুদিন হল দেখছো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম এ বীথি বোকা মেয়ে নয়। চিনে ফেলে নিশীথবাবুর মন্তব্যের সূত্রে।

— আপনি ? এ রকম দেখতে ছিলেন একদিন ?

— কি রকম ?

— চাবুকের মত চেহারা।

— ওটা আমার কৃতিত্বে নয়। ইংরেজ সরকার চাবুক মেরে মেরে বানিয়ে দিয়েছিল। পাশে আমার শালী। শিবানী। কাল এসেছিল। তুমি দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতে না। ছবির ঐ ছিপ্‌ছিপে মেয়ে মোটা হয়েছে কুড়ি গুণ। এটা রেখে দাও। আরও খাম আছে তুঁতে নীল রঙের। দেখ।

— খামটা দিন।

— ওঃ, খামটা বুঝি—

বুকের উপর থেকে খামটা কুড়িয়ে বীথিকে দিলে বীথি ফোটোগ্রাফটা খামে ভরে রাখে। নানান চিঠি উল্টে খোঁজে তুঁতে নীল খাম।

— দেখুন তো এটা কিনা।

খামটা হাতে দিয়ে সেই নাকের কাছাকাছি এনে চিঠিটা বের করেন। খামটা শুকনো পাতার মত তাঁর বুকে ঝরে পড়ে। চিঠির ভাঁজ খুলে পড়ার চেষ্টা এরপর। পড়েনও কিছু সময়। কিন্তু সবটা পড়তে কষ্ট হবে চোখের। তাই খোলা চিঠিটা ভাঁজ করে এগিয়ে দেন বীথির দিকে।

— পড়ে শোনাও তো।

বীথি পড়তে থাকে।

— জামাইবাবু, গতকালের খবরের কাগজে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণার খবর পর থেকে আমি ও সমীর খুব দুশ্চিন্তায়। অনুমান করছি, এতক্ষণে হয়ত খানাতল্লাশি শুরু হয়ে গেছে আপনার

বাড়িতে। পুলিসের হাতে পড়তে পারে ভেবে চিঠিখানা অন্য ঠিকানায় পাঠাচ্ছি। জেলখানার বাইরে থাকলে হয়তো পেয়ে যেতে পারেন।

নিশীথবাবু থামিয়ে দেন বীথিকে।

—না, এ চিঠি নয়। এ চিঠি অনেক পরের। ওটা রেখে দাও। আরো আছে। দেখ, পেয়ে যাবে।

বীথি চিঠিটা খামে ভরে অন্য অজস্র চিঠির জঙ্গল থেকে তুঁতে নীল খাম খুঁজতে থাকে। নিশীথবাবু চোখ বুজিয়ে। জানেন—ঝাপসা, এলো-মেলো হয়ে গেছে তাঁর স্মৃতি। ধারাবাহিকভাবে কিছু মনে আনতে পারেন না আর। নিকট-দূর একাকার হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তবু চেষ্টা করেন চল্লিশ বছর আগেকার জীবনের একটা বিশেষ পর্বের ডুবো নৌকোকে ডাঙায় তুলে আনতে পারেন কিনা। পারেন কি না সেই সময়ের অভিভূত জীবনযাপনের দিন ক্ষণ দণ্ড পলকে পর পর সাজিয়ে নিতে। বীথি চিঠি খুঁজছে, খুঁজুক। চিঠিতে তো পাবেন মনের কথা। তিনি শিবানীর মনের কথাগুলোকে আরো স্পষ্টতর করে তোলার জন্যেই নিজের মনে বানিয়ে নিতে চান সেই সময়কার পটভূমি। সেই সময়ের শিবানীকে প্রত্যক্ষ করতে চান সিনেমার মত বাস্তবতায়। হ্যাঁ, একটু একটু করে মনে পড়ছে।

তাঁর শোবার ঘরের জানলার ওপারে ছড়ানো বাগান। জানলার পাশ দিয়েই দোতলায় উঠে গেছে জুঁইয়ের লতানো ঝাড়। মালী আসার আগেই শিবানী বাগানে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গাছ দেখে। কোন্ গাছের জন্যে দরকার সার, কোন্ গাছে লেগেছে পোকা, ডাল ছাঁটতে হবে কোন্ কোন্টার, সেসবের হিসেব কষে নেয় মালীকে ফরমাশ করতে। রঙ্গনার গুচ্ছ হাতে নিয়ে বাগান থেকে সোজা চলে আসত তাঁর ঘরে। শিবানী ঘরে ঢুকলে একটা গোটা বাগানের সমস্ত ফোটা ফুলের সুগন্ধের ঘ্রাণ পেতেন তিনি। শিবানীও তখন বাগানের অংশ। লতায় পাতায় মোড়া ফুলের থোকা যেন আরেক রকমের। মনে পড়ছে তাঁর, শিবানীর শরীর থেকে সকালবেলাকার বাগানের সুস্বাদের সুগন্ধের ঘ্রাণ নিতে নিতেই বলে-

ছিলেন তিনি-জানো শিবানী, যখন কাগজ পড়ি, বই পড়ি, এমন কী মার্কস্‌বাদ পড়ি, তখনও মনের মধ্যে কেমন যেন সংশয় জেগে থাকে, সত্যিই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে কিনা দূর ভবিষ্যতেও কোনো একটা সময়ে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে আমরা গড়ে তুলতে পারবো কিনা সমাজতন্ত্রের ছাঁচে। কিন্তু তোমাদের বাগানের প্রত্যেকদিনের এই অবধারিত ফুল ফোটার দিকে তাকিয়ে, তাদের গ্লানিহীন পবিত্রতার দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস ফিরে আসে। তুমি যখন ফুলদানির বাসি ফুল বদলাও, সেও আমার কাছে প্রতীকের মত হয়ে ওঠে যেন। ঠিক সেই রকমই অনুভূতি হয় রবীন্দ্রনাথের গানে। প্রেমের কিংবা প্রকৃতির গানেও যেন শুনি আশ্চর্য এক বরাভয়। সমস্ত সংগ্রামের শেষে যে সুনিশ্চিত শান্তি, তার আগাম উপলব্ধি জাগিয়ে সংগ্রামের শক্তিকেই যেন বলবান করে দিতে চায় আরও।

—কাকু-উ।

বীথির ডাকে নিশীথবাবু উড়িষ্যা থেকে পলকে কলকাতায়।

—বলো। পাচ্ছ না?

—না। পেয়েছি। অনেক নীল খাম। ক্লিপে আঁটা একসঙ্গে।

—অনেক? তাই নাকি?

এত চিঠি লিখেছিল নাকি শিবানী? এত চিঠি, অথচ সেগুলো আজ আর শিবানীর জীবনের অংশ নয়? এত চিঠির কোনো কথাই কি কখনো মনে পড়ে না তার? নাকি মনের মধ্যেই এসব চিঠির আবেগ-উন্মত্ততাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছে না-মনে-রাখার আগুনে? তার জীবন-কাহিনীতে অতএব এসব চিঠির কোনো অস্তিত্বই নেই আর।

কিন্তু আমি, আমি, আমিই বা, আমিও তো, আমারই তো, আমিও তো, আমারও তো, আমিও যদি না পারি···

—পড়বো? কাকু-উ-উ? পড়বো কি-ই-ই?

—না থাক। চিঠিগুলো আমাকে দাও। তুমি টলস্টয়টাই পড়ো!

বীথি টলস্টয় পড়তে শুরু করে।

নিশীথবাবু তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিমালাকে মুছতে মুছতে বিশ্বসাহিত্যের ভিতরে হারিয়ে যেতে থাকেন ক্রমশ। তুঁতে নীল খামগুলো তাঁর হাতের দশ আঙুলের ভিতরে সেইভাবে ধরা, যেভাবে শিশুরা আঁকড়ে থাকে ঘাসফড়িং, কিংবা প্রজাপতি অথবা আকাশ থেকে পেড়ে আনা বাচ্চা শালিক।

পিতলের ঘটির মানচিত্র

বস্তীতে ফিরে নিতান্ত কথাচ্ছলেই ঘটনাটা বলেছিল খিরির মা। দশ-জনকে শোনানোর জন্যে বলেনি। দশজনকে শুনিয়ে বলার মত ঘটনাও নয়। লোকে বাড়ি ফিরে যেমন বলে—জানো একটা অ্যাকসিডেন দেখনু বটে আজ নেকটাউনের মোড়ে, ইটের লরি চাপা দিয়ে চলে গেছে একটা মুটোরবাইককে—, একেবারে ভাবলেশহীন বলা, খিরির মায়ের বলাটাও ছিল সেই রকম। শহর-বাজারে যাদের কাজ, রাস্তাঘাটের দুর্ঘটনা দেখা তাদের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। দেখে দেখে আর নতুন করে ব্যথিত হয় না কেউ। অথচ যে দেখে, সে কাউকে না কাউকে বলবেই। কোথাও থেকে ফিরে কিছু একটা না বললে যেন যাওয়া এবং ফেরা দুটোই তাৎপর্যহীন। তাই যে কিছু দেখে, সে কিছু বলে। কেউ বলে বলেই অন্য কেউ শোনে। শুনে কড়াক্রান্তি লাভ হবে না জেনেও শোনে কখনো কখনো। যেন এই বলা এবং শোনা একটা পালনীয় সামাজিক প্রথা। দশজনে শুনবে, শুনে মাছির ঝাঁক হয়ে জড়ো হবে এক জায়গায়, এসব না ভেবেই কথাটা বলেছিল খিরির মা।

তবে এটাও ঠিক, ঈষৎ বৈচিত্র্য ছিল তার বলা ঘটনাটায়। সচরাচর

না-ঘটার বৈচিত্র্য। আর সেই কারণেই খিরির মায়ের উঠোন পেরিয়ে বস্তীর অনেকটা ভিতর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল ঘটনাটা। ভোমরার মত একটানা উড়তে উড়তে ছড়ায়নি। ঘাস ফড়িংয়ের মত, লাফে লাফে। ছড়িয়ে পড়াটাও আবার অস্বাভাবিক নয় তেমন। কেষ্টপুর খালের ধারে টালি-খড় নারকেলপাতা অথবা ছই-এর ছাউনি ঘেরা ছিটেবেড়ার এই বস্তীতে বাস করে যে কুড়ি-বাইশ ঘর মানুষ, তাদের জীবন প্রায় সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কোনো না-কোনো কাজের ঘানিতে জোড়া। হামাগুড়ি শেষ, শিরদাঁড়া সোজা, ব্যাস, তখনি কাজের জীবনের শুরু। না-কাজ মানেই যেহেতু না-বাঁচা। আবার একটা জীবন মানে একটা কাজ নয়। বাঁচতে হয় বহু কাজের ফন্দি-ফিকিরে জড়িয়ে। এ বস্তীর পুরুষদের কাজ নানা রকম। মেয়েরা অর্ধেক ঠিকে ঝি, অর্ধেক রাঁধুনি। খিরির মাও ঠিকে ঝি। কাজ করে চার-পাঁচটা বাড়িতে। বাকি সময় ঘুটের ব্যবসা।

বাইরের কাজের সময় বা দিন ফুরোলে কলকাতার এ-অঞ্চল সে-অঞ্চল থেকে বস্তীতে ফেরা মানুষগুলো যেন সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন। অবসর বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন তখন রেডিও। রেডিও-ই বা একটানা শুনতে পারে কে কতক্ষণ? নতুন নতুনই ভালো। তারপর রেডিও চলে, কিন্তু সব সময় শোনে না কেউ। রেডিও চলছে সেটা শোনে। কী চলছে শোনে না। প্রায় একই জিনিস শুনে শুনে তিতকুটে। তবে তেমন রগরগে কিছু হলে গায়ে ঝাঁকুনি। মনোযোগের কান বাঁকে আপনা থেকেই। এই রকম ধরা-বাঁধা জীবনযাপনের মাঝখানে দৈবাৎ কোনো-কোনোদিন যদি বেজে ওঠে সাপুড়ের বাঁশি বা বাঁদর নাচের ঢোলক, ঝিমোনো বস্তীটা নিমেষে গমগম। ওতেই বাইস্কোপ-থিয়েটারের সুখ মিটিয়ে নেয় অনেকে। কিন্তু এসবের কিছুই যখন থাকে না, এমন কি বিদেশী বাসনউলিও আসে না ছেঁড়া শাড়ি কাপড়ের বদলে স্টেনলেস বাসন বেচতে, তখন তো পারস্পরিক কথোপকথনই একমাত্র প্রমোদ। এই আবদ্ধ পরিমণ্ডলে এক-এক মানুষের এক-এক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণের মধ্যেই বরং তারা পেয়ে যায় সমবেত অংশগ্রহণের সুখ।

আরো সুখ যদি কারো মুখে দেশলাইয়ের মত ফস্ করে জ্বলে-ওঠা কোনো কথা বা মত-মন্তব্যকে নিভ্‌বার আগেই জ্বালিয়ে নেওয়া টানা আলাপ-আলোচনার দপ্‌দপানো আলোয়। তর্কে গড়াক সে আলোচনা। জমে উঠুক মতবিরোধ। হাঁপ-ধরা স্যাঁতসেঁতে অবসর গরম হয়ে উঠুক চিৎকারে-চেঁচামেচিতে। তাতেই সেঁকে নিতে পারবে শ্রমের সহ্যাতীত চাপে নেতিয়ে পড়া নাড়িগুলো। টের পেয়ে যাবে এখনও কতখানি জবরদস্ত রকমের জ্যান্ত তারা।

পাঁচটা বাড়িতে কাজ করে খিরির মা। ঘোষ, দাস, চৌধুরী, মিত্তির আর দে। দাসের বাড়ির বাগানে পড়েছিল কবেকার কাটা শুকনো গোলাপের ডাল। তাতেই পড়ল পা। রক্তারক্তি হয়নি। তবে বাঁ পায়ের চেটোয় টনটনে ব্যথা। সেই খোঁড়া পায়েই দীর্ঘ পথ কখনো মাথায় কখনো কাঁধে এইভাবে বয়ে এনেছিল এক বস্তা কাঠ। উঠোনে পৌঁছে মাথা থেকে ধপ্ করে বস্তাটা নামিয়ে মাটিতে বসে পড়েছিল হাঁপ-ধরা শরীরটাকে বাঁকিয়ে। আঁচলের খুঁটে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে একবার হাঁক দিয়েছিল।

—অ বাতাসি। অ কিনু-উ-উ।

সাড়া পায়নি কারো। ঘাম একটু জুড়োতেই বস্তার মুখের দড়িটার বাঁধন খুলতে থাকে। ভিতরে ছোট ছোট বাজে কাঠের টুকরো। পেয়েছে চৌধুরী বাড়ি থেকে। নতুন বাড়ির দরজা-জানলা-আলমারি-চেয়ার টেবিল বানাবার পর উদ্বৃত্ত অদরকারী টুকরো-টাকরা। বাঁধাছাঁদার জন্যে চাইতেই একটা নতুন বস্তা।

—আরে কোথা গেলু অ বাতাসি।

বাতাসি এগার বছরের মেয়ে। এখনি মায়ের বদলি খাটে। সে যেন ঘরের অন্য কোনো প্রান্ত থেকে সাড়া দেয়।

—এত হামলাচ্ছ কেন? গোবর দিচ্ছি।

—কিনুটা কোথা গেল-অ-অ।

—কিনু তো গেছে বাবার সেথে।

—অ। হাঁপি গেছি এগদম কিনা-আ।

—বস্তায় কি আনলে গো ?

দূরের টিউবওয়েল থেকে চান করে, কাপড় কেচে, হাতে কাচা কাপড় নিয়ে যেতে থমকে দাঁড়ায় সাঁতরা বৌ।

—বস্তায় ? কাঠ-কাঠরা।

—কে দিল গো ? ভালো বলতে হয়।

—চৌধুরী-গিন্নী ? বলে রেখেছিনু অনেকদিন আগে।

সাঁতরা-বৌ চলে যাওয়ার জন্যে বাঁকলে খিরির মা কথার টানে আটকায়।

—আজ কি কাণ্ড হয়েছে জানু ?

—কোথায় ? কি কাণ্ড ?

—তুই তো মিত্তির বাড়ি জানু সল লেকের। তার ইপাশে ডান দিকে একটা নতুন বাড়ি উঠেছে দেখেছু তো। তার উদিকে, দক্ষিণ দিকে আর একটা বাড়ি উঠতেছে এখন। মিত্তির বাড়ির পাঁচিলের পশ্চিম ধারে। কদিন ধরে সেই বাড়ির পাতকো খোঁড়া হচ্ছিল। আজ সকালে হৈ চৈ। এক মানুষ সমান মাটির তলা থেকে মজুররা পেয়ে গেছে একটা পিতলের ঘটি। মজুরদের ক্যালরব্যালর শুনে দৌড়ে গেনু দেখতে। আরো অনেক লোক জমা হয়ে গেল। দেখি কি, সত্যি সত্যি আস্ত একটা ঘটি। জলে ধুয়েছে। চক্‌চক্‌ করছে সোনার মতন।

—ও মা, তাই নাকি ? কার ঘটি ?

কথার শুরুতে শ্রোতা ছিল শুধু সাঁতরা বৌ। মাঝামাঝি সময়ে নবনী পাড়ুইয়ের পিসী। একেবারে শেষ দিকে বাতাসি।

—কার ঘটি সে আমি কি করে জানবো ?

—গত্তের থিকেন বেরল ?

—হাঁ গো, গত্ত মানে, মানুষ সমান গত্ত। দেখনু তো নিজের চোখে।

আরো দু'-চারটে কৌতূহল মেটানোর প্রশ্ন করে সাঁতরা বৌ চলে যায়

ভিজে কাপড়ের জল-ছড়া দিতে দিতে। নবনী পাড়ুইয়ের পিসী যায় উল্টো দিকে। বাতাসি বলে

—ডাকতেছিলে কেন?

—আলো বস্তার কাঠগুলো তুলবো বলে।

—দাঁড়াও তবে। হাত ধুয়ে এসতেছি।

খিরির মা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। নেতানো ভাবটা কেটেছে খানিক। তাই মুখ খোলা বস্তার তলার দিকটা ধরে উপুড় করে দেয়। কাঠগুলো ঝুড়ি করে বাতাসি যখন পারবে তুলবে। বস্তাটা তার যেন তখুনি দরকার। বেশি মায়া বস্তাটার উপরই। কাঠ-কাঠরা উনোনে জ্বলতে জ্বলতে ছাই হয়ে যাবে একদিন। বস্তাটা চিরদিনের থেকে যাবে, রাখতে পারলে। আনকোরা নতুন বস্তা। এমনি কি আর দিত? মিত্তির বাড়িতে রাঁধুনি আসেনি কদিন। গিন্নীর গলবস্ত্র অনুরোধে পর পর কদিন মাছ কুটে দিয়েছে। বাটনা বেটে দিয়েছে। তাতেই মনটা গলা-গলা।

২

ঘরে ফিরে সাঁতরা বৌ ঘটির গপ্পোটা বলে সুধাংশু ধাড়ার বৌকে। সুধাংশু ধাড়ার বৌ বলে নির্মল হাজরার বৌকে। নির্মল হাজরার বৌ-এর কাছ থেকে শোনে হরেন পাড়ুইয়ের শাশুড়ি। হরেন পাড়ুইয়ের শাশুড়ির কাছ থেকে শোনে সতীশ সাঁতের মা। তার কাছ থেকে তার বাড়ির বৌ ছেলেমেয়ে।

অন্যদিকে নবনী পাড়ুইয়ের পিসীও বলে বেড়ায় দশজনকে। বলতে বলতে সাবিত্রীর ঘরের সামনে। সাবিত্রী শুনছিল ঘরের ভিতর থেকে। চাল পাছড়াচ্ছিল কুলোয়। ঘটির কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই হাত বন্ধ। কোমরে গামছা। গায়ে ছেঁড়া কাপড়ের ফালি কোমর থেকে পাকিয়ে পিঠে। বয়স বোঝা মুশকিল। প্রথম ঝলকে বুড়ি বুড়ি। খুঁটিয়ে নজর বিছোলে ঢের কম।

নবনী পাড়ুইয়ের পিসীর কথা বলা থামলে সাবিত্রীর প্রশ্ন

—হাঁলো, তুইও দেখেছু নাকি নিজের চখে ?

সাবিত্রীর চোখ দুটো তখন মাজা ঘটির মতই চকচকে।

—আগো আমি দেখবো কোত্যেকে ? আমি কি কাজ করি সি বলকে ? দেখেছো তো খিরির মা। সি বলকের মিত্তিরদের বাড়ির পাঁচিলের উধারে।

—তোর মনে আছে পারুলির মা ?

—কি গা ?

—তোকে বলিনি এগবার ?

—কিসের কথা ?

—একটা ঘটির কথা ?

—ঘটির কথা ? কই শুনিনি তো ?

—তাহলে তোকে বলি নি। আর কাউকে বলেছি।

—কি ঘটি ?

—পিতলের ঘটি লো। এগদম নতুন পারা পিতলের ঘটি। ফেলার বাবাকে বলনু শিবরাত্রি করবো! শিবের মাতায় জল দুবো। একটা নতুন ঘটি কিনে দাওনা। তো দিয়েছিল।

—না আমাকে বলনি কুনুদিন ই সব কথা। ফেলার বাবার কতা অনেক বলেছ টলেছ।

সবাই চলে যায়। সাবিত্রী দাঁড়িয়ে থাকে। পাথরের চাঁই-এর মত নিথর দাঁড়িয়ে থাকা তার। স্মৃতির ওজনও কখনো কখনো বেড়ে যায় জীবনে। স্মৃতিভারাক্রান্ত কথাটা মানুষ বানিয়েছে তাই। সাবিত্রী হঠাৎ সেই স্মৃতিভারেই পাথর। স্মৃতিই তাকে হঠাৎ পৌঁছে দিয়েছে পঁচিশ বছর পিছনে। তার মনে পড়ছে সব। বাঁধের সরু ফাটল দিয়ে বন্যার জল চুইয়ে চুইয়ে ঢোকে প্রথম। পরে সরু ফাটলকে বানায় রাক্ষসের হাঁ। বাঁধ ফাটে। সাবিত্রীর স্মৃতির ভিতরে এখন সেই রকম বাঁধ-ফাটানো জলকল্লোল। সে দেখছে গঙ্গার ঘোলা জলের তোড়। বিরাট বিরাট

পাইপের মুখ থেকে জল ফেটে বেরচ্ছে ফোয়ারায়। ঝড়ের শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে জল। নদীর শব্দ মাটিতে। কত দূরে পা। তবু পায়ের চেটোয় মাটির থরথরানি। তাকালে খাঁ খাঁ করে ওঠে বুক। হাঁটুসমান জল ভেড়ির ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠা জনবসত গিলতে গিলতে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। পাক খাওয়া জলের মাথায় ফেনা যেন ফণা। ছোবলের জন্যে তৈরি ফেনার মাথায় মাথায় জ্বলছে আক্রোশের চোখ। জল যত এগোয় পিছনে জমতে থাকে বালি। বলিদানের কাতানের মত চকচকে বালি। ভেড়ি বুজে গিয়ে বালি। ঘরগেরস্তি চাপা দিয়ে বালি। বনবাদাড় গিলে গিলে বালি। মরুভূমি ধু ধু জাগিয়ে বালি। লোকে বলতে শুরু করেছে বালির মাঠ। ক্রমে জলের চেয়ে বালিই হয়ে উঠল মহাশত্রু। ভদ্দর লোকের শহর গড়ে উঠবে নাকি ঐ বালির উপর। সেই শহর গড়ার জন্যেই বালির গ্রাসে তুলে দিতে হবে তাদের ঘরবাড়ি, জমি-বাগান, গাছপালা সব কিছু। না যদি ওঠে কেউ তাকে বুঝি ঝলসিয়ে দেবে রাগের তাপে, বালির উপর দিয়ে বয়ে আসা দুপুরের রোদে সেইরকম জ্বলুনি তখন।

বালি তখনো তাদের বসবাসের জায়গা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু যেভাবে এগোচ্ছে জল, জাগছে বালির চড়া, পৌঁছে যেতে কদিন আর। ভরসা মাথার উপরে ঈশ্বর। আর হাতের নাগালে চিন্তামণি সিং। বড় পরেশ ভেড়ির মালিক। সবাই গিয়ে তার কাছে জড়ো। কি হবে কত্তা ? চিন্তামণি ভরসা দিয়েছিল, যে যার কাজ করে যা। যা ভাবার আমি ভাবছি। গবরমেণ্টেরও বাবা আছে। কোর্টকাচারি আছে। আদালত আছে। গবরমেণ্টের বাবার ক্ষেমতা নেই আমার ভেড়ির ধারে কাছে ঘেঁসে। চিন্তামণি সিং ভেড়িওলাদের মাতব্বর। তার কথার উপরে কথা নেই। আধখানা সল্ লেকের মালিক। টাকার গাছ। যত টাকা, তত দাপট। তার এলাকায় তিনিই জগদীশ্বর। তাঁর দয়াতেই ভেড়ির আলায় আলায় কত শত মানুষের বসবাস, ঘরসংসার। তারই ভেড়ির খিদমত খাটছে কত আলাজান। ভেড়ির খুচরো মাছ বেচে

সংসার চালাচ্ছে কত পরিবার তারও হিসেব নেই। বাসন্তী সেই মাছ-বেচে সংসার চালানোদের একজন। তার স্বামী বুনত মাছ-ধরার জাল আর বাঁশ-বেতের রকমারি জিনিস।

সত্যি সত্যি ফলেও গেল একদিন চিন্তামণি সিং-এর ভবিষ্যৎবাণী। বাসন্তীরা ভেবেছিল বালি জলের গোগ্রাসে এগিয়ে আসাটাকে তিনি আটকাবেন লেঠেল দিয়ে। রক্তপাতের লড়াই-এ। কিন্তু আটকে গেল অন্য কারণে। সল্ লেকের শিবমন্দিরের পুরোহিত পোল্লে ঠাকুর জমির দখল ছাড়তে রাজি নয়। পুলিশ এল, সেপাই বরকন্দাজ এল, লাঠি এল, বন্দুক এল, গবরমেণ্টের বাঘা বাঘা অফিসাররা এল। লোকে বললে এতেও না হলে নাকি ফুটউইলি থেকে কামান আসবে, গোরা সৈন্য আসবে। এতসব এল বটে কিন্তু পোল্লে ঠাকুরের টিকিটিও ছুঁতে পারলনি। ভক্তের অন্ত নেই তাঁর। পোল্লে ঠাকুর বক্তিতা দিচ্ছে শুনে ঝেঁটিয়ে জড়ো হল দলকে দল। তার সঙ্গে বাজনা বাদ্যি। জয়জয়কার। সে এমন এক হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড চলল কটা দিন পর-পর, যে হাট বসে গেল শিবমন্দিরের সামনে, বেচাকেনার। গবরমেণ্ট পুলিশ তুলে নিলে। ব্যাস, সেই থেকে জলের ছোবল বন্ধ। বালির গ্রাস বন্ধ। আমাদেরও মনের হাহুতাশ বন্ধ। যাক্, বাস্তহারা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবেনি আর রাস্তায়।

ক'মাস সব চুপচাপ। হঠাৎ একদিন সকাল থেকে আবার সেই ডাকাত-পড়া শব্দ। আবার পাইপ উগরোনো জলের অট্টহাসি। আবার জলে জলে সেই সাপের ছোবল ভেড়ির ধারে ধারে মানুষের ঘর-বসতির দিকে। কোথায় ভেসে গেল পোরে ঠাকুর, তার রাগ্-রোষ, তার শিব-মন্দির, তার চেলাচামুণ্ডার তর্জন। লোকে বলল, গরমেণ্টের টাকা নিয়ে পোল্লে ঠাকুর উঠে গেছে ধাপার মাঠের দিকে। গরমেণ্ট জমি দিয়েছে, সেখানেই তুলবে নতুন শিবমন্দির! দেবতাই যদি হার মানে তো মানুষ করবে কি? যতই করকরে কাঁচা টাকার দাপট থাকুক চিন্তামণি সিং-এর, সে তো আসলে মানুষ। তাই কোথায় ভেসে গেল তার সমুদ্দুরের মত

ভেড়ি। আর চিন্তামণি সিং-এর ভেড়ি যদি ভাসতে পারে, অন্যের তো কথাই নেই।

বাসন্তীদের সংসারও তাই একদিন বন্যার জন্যে কচুরি পানা। যথাসর্বস্ব নিয়েই চলে এসেছিল সল্ট লেকের এপারে। তখনো ভি আই পি রোড হয়নি। কাঁচা রাস্তা। তারই ধারে ধারে ঝুপড়ি। জাত ব্যবসা ছেড়ে তার পর থেকেই সে ঠিকে ঝি। তার স্বামী মদন দিনমজুর।

সর্বস্ব নিয়ে চলে এসেছিল ঠিকই। কিন্তু তাদের মত খাটো-খাও মানুষদের সর্বস্ব বলতে আর কতটুকু। কতটুকুরও সে-সবটাই কি পেরেছে নিতে? গাছপালা নিতে পারেনি। কুমড়ো গাছটা লতিয়ে উঠেছিল চালে। হাঁটু সমান ভারায় কি ঝাঁকড়াই না হয়ে উঠেছিল পুঁই গাছটা। পেঁপে গাছের গা ভর্তি পেঁপে। তিন রকমের লঙ্কা গাছ, দু'রকমের লেবু গাছ, নারকেল গাছ, কলাবাগান, ওল গাছ, কচু গাছ, সবই তো গেল জলের পেটে, বালির গ্রাসে। রইল কী? রইল বাঁশের দরজা, টালির ছাউনি, ছিটেবেড়ার দেওয়াল, বাসন-কোসন, পিঁড়ে চৌকি, কাপড়-চোপড়, কাঁথা-কানি, আর কৌটো-বাওটা। ঘর ছাড়তে হবেই এটা জানার পর গরু ছাগল দুটোকেই বেচে দিয়েছিল আগেই। সব কিছু নিয়ে খালের ধারে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ার কদিন বাদেই হিসেব মিলোতে গিয়ে ধরা পড়ল পিতলের ঘটিটা নেই। দুজনেই, স্বামী স্ত্রী, দৌড়ে এসেছিল সল্ট লেকের ভিতরে হাঁটু জল ভেঙে। কিন্তু অনেকখানি এসে শুধু জল আর বালি দেখে ফিরে গিয়ে ছিল শুকনো মুখে। কোথায় যে তাদের ভিটেমাটি কিছুই চিনতে পারল না কেউ। বাসন্তীর চোখ ফেটে জল। মনের ভিতরে হাহুতাশের হল্‌কা। সল্ট লেকের গন্‌গনে হলুদ বালি তার টপ্‌ টপ্‌ চার ফোঁটা চোখের জলকেও শুষে নিয়েছিল নিমেষে। আর তার হাহুতাশ শুনে ঘুরে তাকাবে এমন কোনজন মনিষ্যি নেই তখন চোখের সামনের চরাচরে।

—কে এ এ এ ?

—আমি লো।

—কে, আলোর মা-আ আ ?

—না লো, আমি হাঁপুর মা।

—অ ! দাঁড়াও গো একটু।

হাঁড়ি মাজা বন্ধ রেখে হাত ধুয়ে খিরির মা ঘর থেকে বাইরের উঠোনে। দরজার সামনে বাঁশের কঞ্চি বেয়ে ছনছনে উচ্ছের লতা। ফুল ধরেছে।

—অ মা তুমি ? গলা শুনে একদম ঠাউরোতে পারিনি।

—তোর কাছে ছুটে এনু লো। কি নাকি ঘটি উঠেছে পাতকো থিকে ? তুই যে বাড়িতে কাজ করু, তার পাশের বাড়িতে ? সত্যি ?

—সত্যি নয় ? নিজের চোখে দেখা।

—ঘটিটা দেখেছু নিজের চোখে ?

—কেন দেখবোনি ? পিতলের ঘটি। ময়লা লেগেছিল। মেজেছে-ধুয়েছে। ধোয়াধুয়ির পর লতুনের মত একদম। ঝকঝক করতেছে।

—তলার দিকে তুবড়োনো মতন আছে দেখেছু এটুখানি ?

—হাতে নিয়ে তো দেখিনি। দূর থিকেন দেখেছি। তুবড়োনো মতন আছে কি নেই অত কি আর দেখা যায় দূর থিকেন ? কেন গা ?

—যা যায় সে কি আর আসে গা ? তবু শুনে ইসতক মনটা যেন বক্‌না বাছুরের মত ছটফট্, এগবার নিজের চোখে দেখবার তরে। তুই বিকালা যাবি তো কাজে সে বাড়িতে ?

—যাবো তো।

—তো যখন যাবি, মোকে ডাকিস তো একবার। তোর সঙ্গে যাবো।

—আমার সঙ্গে যাবার দরকার কি ? আগো, তুমি তো আগে কাজ

করেছ ক' বছর সি বাড়িতে। মিত্তিরদের বাড়ি গো। সি বলকে। গোল গোল রথের মত চাকা লাগানো গেট।

—অ্যালসেন কুকুর আছে?

—হ্যাঁ।

—অঃ, সেই বাড়ি? মোটা থপথপে গিন্নী তো? যার বড়ছেলের বৌ মেমসাহেব? ইদেশে থাকেনি। বিদেশে থাকে।

—হ্যাঁগো, সেই বাড়ি। পাতকোটা খোঁড়া হচ্ছে তার পাশের পিছন দিকের বাড়িতে।

—তাহলে চিনি। তবু ডাকিস একবার। তোর সঙ্গেই যাব।

—কেন, দেখতে যাবে কেন ঘটিটা?

—সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় খিরির মা। বলবোখন যেতে যেতে।

৪

ঘটিটা দেখেই চিনতে পারে বাসন্তী। কানার নীচে হুবহু সেই তিন সারি রেখা। আর যেখানে তোবড়ানোর কথা, ঠিক সেই খানেই তোবড়ানো।

নিজেকে সামলাতে পারে না আর বাসন্তী। কেঁদে ফেলে। ঘটির কাহিনী সবই শুনছে খিরির মা। কিন্তু পঁচিশ বছর আগের ঘটির শোকে সে যে এমন করে এতগুলো জন-মজুরের সামনে কান্নায় ফেটে পড়বে, এতটা আন্দাজ করেনি। কাঁদতে কাঁদতেই ঘটিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। কান্না আড়াল করার জন্যে কাপড় চাপা দেয় মুখে। খিরির মা তাকে টেনে আনে মিত্তির বাড়িতে। গ্যারেজের দিকে দরজা দিয়ে উপরে উঠে যায় খিরির মা। বাসন্তী দরজার সামনে বসে পড়ে। উপরে উঠেই খিরির মা বাসন্তীর কান্নার খবরটা জানিয়েছিল মিত্তির গিন্নীকে। গিন্নী দোতলা থেকে বাসন্তীকে ডাকে।

—ও বাসন্তী! কি হয়েছে তোর? উপরে আয় না।

—উপরে যাব, কুকুর বাঁধা আছে ত?

—আছে। জনি তো তোকে চেনে। কি হয়েছে শুনবো, উপরে আয়।

বাসন্তী দরজার কাছ থেকে উঠে দোতলার মুখে গিয়ে সিঁড়িতে বসে। মুখে আঁচল চাপা।

—কি হয়েছে? তুই নাকি কান্নাকাটি করছিস কি ঘটি দেখে?

শোকের সময় সহানুভূতি বিপজ্জনক। মরা শোকেরও ডাল গজায়। ফলে বাসন্তী আবার কাঁদে, খানিক কেঁদে নিয়েই বলে

—তমাকে বলি নি বড়মা আমার হারানো ঘটির কথা? বলিনি তমাকে?

—তা হয়তো বলেছিস। হ্যাঁ, বলেছিলি বটে। কিন্তু তার জন্যে এখন কাঁদছিস কেন?

—পাতকোর ঘটিটা তো আমার সেই ঘটি গো বড় মা।

—ওমা তাই নাকি? তুই চিনলি কী করে?

—তমাকে বলিনি বড়মা, তলার দিকে তুবড়ে গিছল এট্টুখানি। ঠিক সেই টুকুনই তুবড়োনা।

—আরে সে তো শাবল লেগেও তুবড়োতে পারে।

—শাবল লাগলে তো চোট্ খাবে। উতো চোট্ খাবার দাগ নয়। হাত থিকেন পড়ে গিয়েছিল শিবমন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে ফিরবার সময়। তাছাড়াও চিহ্ন আছে। কানার নীচে তিন সারি দাগ ছিল। তাও রয়েছে। কতদিন নাড়াচাড়া করেছি। নিজের জিনিস চিনতে পারবোনি? হাতে নিনু। একদম সে ওজন।

বাসন্তীর হাত বাতাসে ছবি আঁকে। ওজন আঁকে।

—তো তার জন্যে কেঁদে কি করবি বল। যাদের বাড়ি হচ্ছে তারা তো কেউ নেই এখানে যে ডেকে বলবো। তারা আসে সপ্তাহে একদিন, রবিবার শুধু। গাড়ি করে সপরিবার আসে। ঘোরাফেরা করে। চলে যায়। ওসব মজুরদের বললে ওরা কি আর দেবে?

—শুদু কী আর ঘটির শোকে কাঁদতেছি বড়মা। ঘটির শোকে নয়।

—তবে আবার কি ?

ঠিক সেই সময়েই মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায় ছোট মেয়ে রেশম। যাদবপুরের কমপারেটিভ লিটারেচরের ছাত্রী। নাচ জানে। গান শেখে।

—কি হয়েছে মা ? বাসন্তী না ?

মিত্তির গিন্নী সংক্ষেপে ঘটনাটা বলেন। সব শুনে রেশমের প্রশ্ন হাসতে হাসতে

—পঁচিশ বছর আগের হারানো ঘটির কথা এখনো মনে আছে তোমার ?

—থাকবেনি দিদি ? শিবের থানে জল দিয়েছি বছর বছর। মনে থাকবেনি ?

—যাক্ গে, ধরে নাও ও ঘটি আর পাবে না। তুমি যা বলছ ওটা তো আর প্রমাণ হতে পারে না। তোমার না হয়ে অন্য কারো হতে পারে।

—আবার কার হবে উ ঘটি। মোরা দশঘর ছিনুম পাশাপাশি। শহর হবে বলে জলে ভাসি দিল, বালিতে ডুব দিল মোদের ভিটেমাটি, বাড়ি বাগান সব কিছু। মোরা দশঘরই তো গিয়ে পড়নু খালের উপারে। ছই বেঁধে থাকি। আর কেউ তো তখন বলেনি ঘটি হারানোর কতা।

—বলেছে কি বলেনি, তারও তো কোনো প্রমাণ নেই। আর ব্যবহার করা জিনিশ মাত্রেরই কোথাও না কোথাও তোবড়ানো হতে পারে। তুমি কেঁদে ঘটিটা নিয়ে চলে গেলে। তারপর আর একজন যদি তোমার মতই কাঁদতে কাঁদতে বলে, ওটা ছিল আমার ঘটি।

বাসন্তীর বুকে আবার কান্নার মেঘ ডাকে। কান্নাকে সংযত করে সে যুক্তিগ্রাহ্য কিছু বলার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে চায়।

—শুধু ঘটির জন্যেই কি আর কান্না এসতেছে ? তা নয় গো। সব মনে পড়তেছে যে একে একে। যিখেনে পাতকো খুঁড়েছে, উখেনেই ছিল মোর হেঁসেল ঘর। যিখেনে তমাদের বাসন মাজা হয়, কলতলা, উখেন পর্যন্ত

ছাড়িয়ে ছিল মোদের বাগান। কলাবাগান, নারকেল বাগান, কচু বন। মনে পড়ে যাচ্ছে গো সব একে একে। আর তমাদের গ্যারেজের কাছে ছিল গোইলে।

—তোমার মাথায় পোকা হয়েছে, বুঝলে বাসন্তী। তাই এসব উল্টোপাল্টা বকছ।

রেশমের গলায় বেতের চাবুকের শব্দ। তখনই রেশমের পাশে এসে দাঁড়ায় তার দাদা অলোক। মা ও বোন দুজনের কাছ থেকে সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে নেয় সে।

—কৈলাসের মা-আ, চা হয়নি এখনো? এ্যাই রেশম, একটা টুল এনে দে তো।

রেশম টুল এনে দিলে অলোক বসে। মিত্তির গিন্নী চলে যান। মাকে চলে যেতে দেখে অলোক সিগারেট ধরায়।

—হ্যাঁ, বল তো বাসন্তী!

অলোক লেখক। ছোট গল্প লেখে লিটল ম্যাগাজিনে। ঘটনার সারাংশেই সেই অভাবনীয় এক ছোট গল্পের সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে তৎক্ষণাৎ তার মাথায়। অলোকের গায়ে-পড়া-আগ্রহে রেশম চটে যায় আরো।

—তুই এখন বসে বসে ঐ সব সাতকাহন শুনবি? আষাঢ়ে গপ্পো সব।

—শুনলে দোষ কী? বাসন্তী বল তো।

—কি বলবো বাবা!

—ঐ যে কী বলছিলে?

—আর শুনে কী করবে! ভেসে-যাবা জিনিস তো আর ফিরে পাব নি কখনো। মনের বাড়া শত্রু নেই। তাই মনে পড়িয়ে দিয়ে বুকে যেন পাবক জালি দিয়েছে বাবা।

—কি মনে পড়ছে বল না শুনি।

—সবই মনে পড়তেছে বাবা। যিখেনে ঘটিটা পেয়েছে উখেনে ছিল মোর হেঁসেল। তার উপাশে জঙ্গল। সন্ধে হলে শিয়েল ডাকত। আর

ইপাশে তমাদের কলতলা পর্যন্ত, কি কলতলা ছাড়িয়ে বাগান। ইপাশে গ্যারেজের কাছে, যিখেনে তমাদের গাড়ি থাকে। সিখেনে ছিল গোইলে। আর তমাদের ঐ রথের চাকা লাগানো গেটের কাছ-বরাবর ছিল মোদের ছিটেবেড়ার ঘর। ডুখানা ঘর, হেঁসেল আর গোইলে। গোইলের পর প্রকাণ্ড বাঁশবাগান। হরেন বাগদীর। তমাদের যিটা হলঘর, সিখানটায় ছিল ছোট্ট মতন একটা পানাপুকুর। ডোবা গো, ডোবা। নোংরা কাপড়-চুপোড় কাচাকাচি হত। মস্ত বড় একটা তেঁতুল গাছ ছিল তার পাড়ে। ঝরা তেঁতুলের বউলে পানা-পুকুরটা লাল হয়ে যেত। তমাদের উপাশে ঐ সাদা বাড়িটা, দুতলা, লাল টালির বারান্দা ঐখেনে ছিল কামার-শালা।

—তোর এসব শুনতে ভালো লাগছে দাদা?

রেশমের চোখে কটকটে লাল রাগ। রি রি করছে সর্বাঙ্গ। ব্ল্যাকে পঁয়ষট্টি হাজারের কাঠায় কেনা তাদের এই প্রায়-প্রাসাদতুল্য বাড়িটা একটা পচা ডোবার উপর, এটা শোনা মাত্রই ঘুলিয়ে উঠেছে তার গা। লম্বা ডাইনী-মার্কা মুখের বাসন্তীর চোখ-ছলছল কথাগুলো যেন করাতে ফালা ফালা করতে চাইছে তার অভিজাত্যবোধ।

—এরপর বলবে তোর স্টাডিটা একটা মড়া-পোড়ানো শ্মশানের উপর।

—সে তো হতেই পারে। বাসন্তী, তোমাদের শ্মশান ছিল না? কেউ মরলে কোথায় পোড়াতে?

—সে ইদিকে ছিলনি। এখন যিখেনে বাসরাস্তার ধারে গোল মারকিট হয়েছে, উদিকে। ঐ যে ডোবার কথা বলনু, তার উত্তর পাড়ে ছিল বড় বড় নিম, শিমূল, শিরীষ, খিরিশ, অর্জুন গাছের বন। তার ভিতরেই ছিল বকুলবালার ঘর।

—বকুলবালা কে?

—সে তমাদের শুনতে হবেনি। চিন্তামণি সিং-এর মেয়েমানুষ।

—চিন্তামণি সিংটা কে?

—ওমা চিন্তামণি সিং-এর নাম শোনোনি? সেইই তো ছিল বড় পরেশ ভেড়ির মালিক। দু পক্ষে লাঠালাঠি, রক্তারক্তি। ইদিকে বড় পরেশ ভেড়ির চিন্তামণি। উদিকে ছোট পরেশ ভেড়ির রামচরণ। মহিষ-বাথানের হরিপদ মাঝির মেয়ে ফুটকিকে নিয়ে। সেই ফুটকিই পরে হয়েছিল বকুলবালা।

—দাদা, তোর কি হয়েছে বল তো? ভাল লাগছে এইসব ভালগার কথাগুলো শুনতে?

—তোর যখন খারাপ লাগছে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমি তো ইতিহাস শুনছি। মহেনজোদারোর মত একটা চাপা পড়া ইতিহাস। হ্যাঁ, তারপর কি হল বাসন্তী?

—বলি বাবা।

বাসন্তী বলার জন্যেই ব্যাকুল। তার স্মৃতির ভিতরে সিনেমার ক্যামেরার জুম ব্যাকের মত পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে জলজঙ্গলময় জনবসতির সেই পঁচিশ তিরিশ বছর আগেকার মানচিত্র। নিজের হারানো ভিটেটাকে সনাক্ত করতে পেরে সুখ তার সীমানাহীন। বলবে বলেই যে আঁচলে চোখের জলের দাগ মোছে মুখ থেকে, তারই গিঁট খোলে। ছোট্ট কৌটো, ভিতরে দোক্তা। শুকনো গলাটাকে, জিভটাকে রসিয়ে নিতে চায় সে।

স্তালিনের রাত

অনেক বছর পরে আজ অঝোর বৃষ্টিপাতের মত তুমি, সারাটা দিনই। অদ্ভুত এক কার্যকারণে মনে পড়ল, ক্রমশ পড়ছে, তোমাকে।

এই মুহূর্তে আমার ঘাড়ের উপর পূর্ব ইউরোপ। কালকের মধ্যে লিখতে হবে একটা প্রবন্ধ, চাকরির কাগজে। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের অটল মহিমার দুর্গগুলো, সিনেমায় দেখা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনও ধ্বংসদৃশ্যের মত যখন ভেঙে খান্‌খান, সেই ধ্বংসের নাভীমূল থেকে উদ্গীর্ণ ধোঁয়ার যে অংশটা কালবোশেখির মেঘের মত কালো, রাজনৈতিক পণ্ডিতেরা সেটার নাম দিয়েছে স্তালিনবাদ। অ্যানা লুই স্ট্রং-এর 'স্তালিন যুগ'টা পড়তে চেয়েছিলাম সেই কারণে।

র‍্যাক থেকে বইটা নামিয়ে মলাট উল্টোতেই আপাদমস্তক কাঁপানো স্মৃতি-মর্মর। উৎসর্গপত্রে তোমার নিজের হাতের সবুজ ক্যালিগ্রাফী—

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো।"

সৌম্যকে, ভালোবাসায়

করুণাদি

১৬।৮।৫৭

মুহূর্তের ঝাঁপে তখুনি ৩৭ বছর পিছনে।

২

কফি হাউস থেকে দৌড়চ্ছি তোমাদের বাড়ির দিকে। অলিম্পিক দৌড়ে যেমন একজনের হাত থেকে জ্বলন্ত মশাল চলে যায় অন্যের হাতে, সেইভাবেই দৌড়। গত তিনদিন ধরে যে-কফি হাউসে ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়ার প্রচার-কৌশল নিয়ে অবিশ্রান্ত হাসি-ঠাট্টার কিচিরমিচির, তখন সেখানে শ্মশানের স্তব্ধতা। মৃত্যু এসে হুকুমদারি করলেই মাথা নুইয়ে বলবেন—তথাস্তু, লৌহমানবের অস্তিত্বে মরচে পড়েনি এতখানি, বা পড়তে পারে না কখনওই, এইরকম একটা মনগড়া বিশ্বাসকেই ধ্রুব বানিয়ে নিয়েছিলাম আমরা কেউ কেউ। তাই ঘা-টা লেগেছিল বেশ জোরেই। পার্টি আপিস থেকে কল্যাণদা এসে চেয়ারে বসামাত্রই, তাঁর বিবর্ণ মুখটাকে মনে হল ছাপানো টেলিগ্রাম। তাঁকে ঘিরে তখুনি চাপ-চাপ গোলাকার ভিড়। কখন, কিভাবে, কোন এজেন্সির খবর, তাস কি বলেছে, মেডিকেল বুলেটিন তো কাল রাত্রে বলেছিল, তাহলে, তবে, এইসব খুচরো কথা, দীর্ঘশ্বাস, কাতরতা, হা-হুতাশের ভিতর থেকেই গুমরে গুমরে ভারি হয়ে উঠছিল শোক। সম্মিলিত শোক যখন দাউ দাউ, নিজের মশালে তারই অগ্নিকণা জ্বালিয়ে বৈঠকখানার ৩৬ নম্বর মাধব কুণ্ডু লেনের দোতলার দিকে।

দরজা খোলা, অথচ ভিতরে অন্ধকার। চৌকাঠ পেরিয়ে ডাকি। সাড়া পাই না। তাহলে কি বাথরুমে? কান পাতি। না জলের শব্দ নেই। এক পা এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরে সুইচ বোর্ডে হাত ছুঁইয়ে আলো জ্বালাতেই তোমার গলা।

—আলো জ্বেল না সৌম্য।

আলো নিভিয়ে দি। ঐ এক ঝলক আলোতেই তোমাকে দেখা হয়ে যায় আমার। স্কুল থেকে ফিরে কাপড় ছাড়নি। মনে হচ্ছে ঘামটুকুও মোছনি মুখের। বসে আছ খাটের এক কোণে। দেয়ালে পিঠ রেখে,

একটু হেলে। হাঁটু ছুটো মোড়া। একটা আলগা হাত হাঁটুতে। অন্যটা ডানদিকের গালে কিংবা মাথায়।

ঐ ভঙ্গি থেকেই আমি পড়ে নিই, খবর পেয়ে গেছ তুমি। তাই গলার স্বর ভিজে। কান্নার ফালির মত উচ্চারণ তাই।

একটু পরে ভিতরের অন্ধকার চোখ-সওয়া। পুবের বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে কলকাতার আলো ঘরে ঢুকতে গিয়েও দ্বিধাগ্রস্তের মত ছু' পা পিছিয়ে। আউট অব ফোকাস ছবির মত ঘরটা।

দীর্ঘসময় সংলাপহীন দাঁড়িয়ে। তুমি বসতেও বললে না। হয়ত শোকে পাথর। কিন্তু আমি তো তোমার কাছেই দৌড়ে এসেছি সবার আগে, শোকের অংশভাগী হতে। তুমি পাথর হয়ে থাকলে, কার কাছে ভাঙব আমার ভিতরের হু হু জলস্রোতের বাঁধ?

—রুমি কোথায়?

তুমি কিছু একটা বলবে, এটাই চাইছিলাম তখন। আমি জানি রুমি কোথায়। সে একতলার ভাড়াটের বাড়িতে খেলছে। তুমি উত্তর দিলে না। ভুল প্রশ্ন করে বোবা। এইসব ব্যক্তিগত পারিবারিক প্রশ্ন সত্যিই বেমানান, সারা পৃথিবী যখন শোকার্ত। কিংবা সঙ্কটাপন্ন যখন গোটা সমাজতান্ত্রিক ছুনিয়া।

—তুমি কখন খবর পেলে?

আলমারির কাছে চেয়ারে বসে আরও আন্তরিক আর ভারাক্রান্ত গলায় আমার জিজ্ঞাসা।

এবারেও উত্তর দিলে না। আলমারির কাঁচে তোমার প্রতিবিম্ব। একটা ঘরে ছুজন তুমি। ছুজনেই দূরের গানের মত অস্পষ্ট। তোমার দিকে তাকাই না আর। যেহেতু অনেক বেশি আবছা, তাই অনেক সহজে তাকানো যায় তোমার প্রতিবিম্বের দিকে। উত্তরহীন হবে জেনেও প্রতিবিম্বের সঙ্গে কথা বলি আমি।

—দেখ, এই বোবা অন্ধকার আমার ভাল লাগছে না। তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে শোকের বোঝাটা কমানোর জন্যেই দৌড়ে এসেছি

এখানে। কোন কথাই যদি না বল, তাহলে চলে যাই।

প্রতিবিম্ব নড়ে ওঠে।

—আমার কাছে এস সৌম্য।

কাছে গিয়ে টের পাই তোমার কান্না।

—আজ আমার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কারুরই নয় সৌম্য

৩

৩৭ বছর বেশ লম্বা একটা সময়। সেদিনের সব কথাই যে মনে আছে এমন নয়। তবে তোমার কথা বলার ধরন এখনও যেন কানে স্পষ্ট। নিজেকে নিয়ে স্বগতোক্তির ধরনে কথা বলার সময় তোমার চোখ-মুখের বিশেষ ভঙ্গিটাও ভুলিনি এখনও। ঠোঁট দুটো জুড়ে যাবে। সামান্য ছুঁচল হয়ে জোড়া-ঠোঁট এগিয়ে আসবে সামনে। একবার কিংবা দুবার বুজে যাবে চোখের পাতা। তারপরই বলবে,

—আমার খাতার সবকটা পাতাই সাদা রয়ে গেল সৌম্য।

কিংবা

—আর কার জীবনে আমার মত এত নৌকোডুবি বল?

কিংবা

—আমার চেতনার রঙে কোনও পান্নাই সবুজ হল না শেষ পর্যন্ত।

যখন তোমার সঙ্গে আলাপের শুরু, তখন তোমার এই জাতীয় উচ্চারণকে মনে হত এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা। বাড়াবাড়ি রকমের আত্মঘোষণার আকাঙ্ক্ষা। পরে তোমার জীবনের প্রায় সমস্ত রকমের ফাটল, খাদ, গহ্বর, ধ্বংসস্তূপ জানা হয়ে যাওয়ার পর, বা জানা হতে হতে, অথবা জানতে জানতে তোমার নির্ভরযোগ্য নিকটজন হয়ে ওঠার সময় এসব কথার প্রতিধ্বনি তোলপাড় তুলত আমার রক্তে। আরও পরে, যখন তোমার মেঘ-রৌদ্রের বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আমার নিজস্ব আবর্তপথ, তখন বুঝতে শিখি, মেলাঙ্কলিয়া তোমার আজন্মের ব্যাধি।

কিন্তু এসব পরের কথা এসে যাচ্ছে কেন আগে? সেদিনের মানে স্তালিনের মারা যাওয়ার রাতটাকেই শুধু মনে করতে চাই আজ।

৪

আলো জ্বলেছিল রাধুর মা আসার পর। রাধুর মা-এর জন্যেই উঠতে হয়েছিল তোমাকে। রান্নাঘরে গিয়ে বোঝাতে হয়েছিল রান্নাবান্না। রাধুর মা রান্নার পাট চুকিয়ে চলে যাওয়ার পর তুমি যখন রুমিকে খাওয়াতে বসেছ রাতের খাওয়া, তখনই একসঙ্গে রণজয়দা, নন্দিতাদি, বাঁশরিদি, সুবোধবাবু আর কিরণবাবু। সকলেই শোকার্ত। প্রত্যেকের মুখেই বিষণ্ণতার উল্কিছাপ। আর প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত শোকের তাপমাত্রা বোঝাতে ব্যগ্র। শোকজ্ঞাপন ভাল। কিন্তু অনেকে মিলে শোকের বিজ্ঞাপনে ব্যস্ত হয়ে উঠলে, শোকের আবহাওয়ার অকালমৃত্যুর জন্যেই শোক জানাতে হয় তখন। কল্‌কল্‌ খল্‌খল্‌ রাশীকৃত কথার ভিড়ে মনে হচ্ছিল তোমার অখণ্ড নীরবতা ছিল এর চেয়ে অনেক শ্রদ্ধেয়।

—আমি চলি।

উঠে দাঁড়াতেই তোমার কান্না-লুকনো করুণ চোখ দুটো সরাসরি আমার দিকে। অনুরোধ আর আকুতি একসঙ্গে।

—একটু পরে যেও। বোসো।

বসি। এরই একটু পরে দোতলার ভাড়াটের বড় মেয়ে তুকাই এসে তোমাকে বলে, টেলিফোন। তুমি উঠলে রণজয়দারাও সবাই ওঠে।

টেলিফোন ধরে ফিরে এসে অনুরোধ নয়, যেন আদেশ, এমনি ভঙ্গিতে।

—তুমি আজ এখানে থাকবে সৌম্য।

আমার বিস্ময় ফুলতে ফুলতে বেলুন। কোথায় থাকব আমি? একটা বেডরুম, একটুখানি রান্নাঘর, এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় আসন পেতে খাওয়া আর পূর্ব দিকে এক ফালি বারান্দা। এর মধ্যে আমার জায়গা জুটবে কোথায়?

রান্নাঘরে গিয়ে তোমার খাবার বাড়া দেখে অবাক। আরও অবাক, তুমি যখন খেতে ডাকলে।

—প্রদোষবাবু আসার আগেই আমরা খেয়ে নেব?

—ও আজ আসবে না।

—আসবে না?

—স্তালিনকে নিয়ে বিশেষ পাতা হবে ওদের কাগজে। তাই থাকতে হবে সারা রাত। সারারাত। সেই প্রথম সারাটা রাত তোমার সঙ্গে। ঘরে নয়, খাটে নয়, রুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর বিছানা পেতেছিলে বারান্দায়। বিছানা মানে একটা মাদুর আর দুটো বালিশ। অবশ্য এর চেয়ে বেশি দরকারও ছিল না সেদিন। মার্চেই কলকাতার আকাশে আগুন। বাতাসে তার হল্কা।

—তুমি কখন ঘুমোও?

—আমি? বারোটা-একটার আগে কখনই নয়। সবাই ঘুমোয়। আমি লিখি।

—রাত জাগতে পার?

—কেন পারব না। রাত জেগে ক্লাসিকাল গানের কনফারেন্স শুনি না ফুটপাথে বসে?

—আমরা আজ ঘুমোব না কেউ। পারবে তো?

৫

সারারাত কথা বলে গেলে মূলত তুমি একাই। প্রত্যেকটা অক্ষর মনে নেই এখন আর। কিছু কিছু আছে। স্তালিনের মৃত্যুতে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ক্ষতির যে বিরাট সম্ভাবনা, তারই সঙ্গে তুমি মিলিয়ে চলেছিলে নিজের জীবন, তোমার জীবনেরও সম্ভাব্য শূন্যতা। ঠিক ঐদিনই অত ব্যক্তিগত হাহাকারে বিরক্ত হচ্ছিলাম খানিকটা। স্তালিনের মৃত্যুতে আমাদের অস্তিত্ব তখন রক্তহীন। মনের ভিতরকার শক্ত-সমর্থ বোধ-বিশ্বাস হালকা-পলকা হয়ে আসতে চাইছে ক্রমশ। বিশ্বাসের অন্য কোন

একটা আপাত অবলম্বনের জন্যে, জলে ডোবা মানুষের ভঙ্গিতে, চেতনার অভ্যন্তরে তোলপাড় অস্থিরতা। কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম যখন, পাশ থেকে সমীরণদা বলেছিল।

—কালই না ঝাঁপিয়ে পড়ে আমেরিকা।

কোনও কোনও কথার মধ্যে ঝড়ের বাতাস থাকে। কথা থামলেই ভাবনাগুলো হয়ে ওঠে এমনই কল্পনাপ্রবণ যে, মনে হয় বিশাল কোনও ভাঙচুর বুঝি অদূরেই অপেক্ষমাণ। আমি ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে কথা বলে নিজের শূন্যতাবোধের শীতলতাকে উত্তাপ যোগাতে পারব অনেকখানি। কিন্তু বৃহত্তর শূন্যতাবোধের ওপর, মরার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মত, তোমার ব্যক্তিগত শূন্যতাবোধের চাপে যেন কোনও গভীর জল তলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল আমাকে।

—অন্য কোন কথা বল করুণাদি। ঠিক আজকের রাতে এত নিরাশাধ্বনি···এত সহজে ভাঙব কেন আমরা?

অসম্ভব সাহসে তোমার বাঁ হাতটা মুঠোয় তুলে নিই। তুমি সরিয়ে নিলে না। সেই প্রথম আমার হাতে তোমার হাত। হাতছানি দিয়ে চলেছিল অনেকক্ষণ। মাদুরের ওপর তোমার বাঁ হাতটা ছড়িয়েছিল যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়া, পড়ে নিভে-যাওয়া কোনও নক্ষত্রের টুকরো।

—ভাঙার কথা কখন বললাম সৌম্য?

—ভাঙার কথা বলনি। কিন্তু তোমার কথার মধ্যে ভেঙে-পড়া মনের সুর।

—ছেলেমানুষ রয়ে গেছ এখনও। বেশ, তাই যদি শুনে থাক, তাহলে তো কই প্রশ্ন করলে না, কেন বলছি কথাগুলো? এত কাছে থেকেও তুমি অনুমান করতে পারছ না, কি ধরনের চাপ আসবে এরপর আমার ওপর?

—শুধু তোমার ওপর বলছ কেন? গোটা সোস্যালিস্ট ওয়ার্ল্ডের ওপরই তো···

—শোন সৌম্য, সোস্যালিস্ট ওয়ার্ল্ডের সমস্যা কীভাবে সমাধান

করতে হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অনেক মাথা রয়েছে আমাদের পার্টিতে। ওটা যৌথ সমস্যা। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনটা একা আমার।

—তোমার ব্যক্তিগত জীবনের ওপর চাপ দেবে কে?

—খুব প্রতিশ্রুতিবান কবি হতে গেলে একচক্ষু হরিণ হতে হয়, তাই না সৌম্য? তুমি নিশ্চয়ই উপন্যাস লিখবে না কখনও। উপন্যাস লিখতে হলে দুচোখে তাকাতে হয়। এবং এক দিকে নয়, চার দিকে, দশ দিকে, দৃশ্যের ভিতরে, খোসা-ছাল-খোলস ছাড়িয়ে বীজ পর্যন্ত।

বুঝতে পারি রেগে গেছ। তোমার মুখে মাঝরাতের অন্ধকার। দূরের মোড়ে টিমটিমে রাস্তার আলো ছাড়া আলো নেই আর কোথাও। রাত কত অন্ধকার হতে পারে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে এমন নিখুঁত করে চোখে পড়েনি কখনও। মুখে ক্ষমা না চেয়ে আমি গোটা শরীরটাকে তোমার হাতের দিকে ঝুঁকিয়ে চিবুক রাখি তার ওপর। নিশ্বাস ভরে যায় তোমার শরীরের ঘ্রাণে। সেই প্রথম তোমার ৩২ বছরের শরীর আমার ২৪ বছর বয়সের ঘ্রাণে! মনে হল আর কখনও কথা বলবে না, এমন চুপ তুমি। তখনই টের পাই, সমস্ত কলকাতা চুপ। চুপ আর উৎকর্ণ। যেন নিশ্বাস বন্ধ করে শোকের কালো পোশাক পরা রাতটা আমাদের কথা বলাবলির দিকে তাকিয়ে।

—কিছু বলছ না কেন?

—বলে কোনও লাভ নেই সৌম্য। তুমি বুঝবে না।

—বুঝব, বল।

—আমাকে বলতে হবে কেন? এতদিন আসছ, প্রদোষ আর আমার মধ্যে কীভাবে লম্বা হয়ে উঠছে ব্যবধান, চোখে পড়েনি তোমার? তুমি টের পাওনি আমার কমিউনিস্ট হওয়াটা ওর জীবনের সাকসেস অর্জনের পক্ষে কীরকম বাধা হয়ে উঠছে ক্রমশ।

—সে কি? প্রদোষবাবু তো পার্টির সিমপ্যাথাইজার?

—ছিল। থাকতে চাইছে না আর। থাকলে যে অর্গানাইজেশনকে

আঁকড়ে নিজের কেরিয়ার গড়তে চাইছে, সেটা হবে না। কাল থেকে তো আর থাকতেই চাইবে না।

—কাল থেকে কেন?

—স্তালিন মারা গেছে। ও বলবে, কমিউনিজম শেষ। শুধু বলবে না, আমাকেও চাপ দেবে পার্টি ছাড়ার জন্য।

—কিন্তু তুমি তো আর ছাড়বে না?

—তাহলে প্রদোষকে ছাড়তে হবে। আর কোনও বিকল্প নেই এর।

—ওঃ, তুমি তখন এই জন্যে বলেছিলে, আজ আমার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কারোরই নয়?

কথা না বলে আমার চিবুকের তলা থেকে হাতটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসলে আধশোয়া তুমি। উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। আমিও সোজা হই। রাতটা আগের চেয়ে বেশি কালো বলেই হয়ত তোমাকে মনে হচ্ছিল ছবির বইয়ে দেখা মর্মর মূর্তির মত মোলায়েম। আর তখনই, এক লাফে নয়, ধীরে ধীরে আমার ২৪ বছরের শরীরের নিরামিষ জনপদে, জেগে উঠছিল হিংস্র জঙ্গল, জঙ্গলের রক্তপায়ী বাঘ বরাহ চিতা।

আমার ভিতরে যেন ভূমিকম্প। অথবা ভূমিকম্পের ভিতরেই যেন আমি। কোনটা ঠিক, এখন, এত বছর পরে মনে পড়ছে না। কিন্তু ঠিক যা, তা হল এক ধরনের রূপান্তর। ক্রমশ অ্যাডাল্ট হয়ে উঠছিলাম আমি। পূর্ণবয়স্কই নয় শুধু, পূর্ণমনস্কও। অজস্র কথা, যুক্তি, তর্ক, আবেগ, তোমাদের একতলার ছোট্ট চৌবাচ্চা-উপচানো জলের মত আমার ভিতরে ফুলে-ফেঁপে উঠছিল, তখন।

কি চাইছ তুমি আমার কাছে? কবিতা নয়, উপন্যাস? অর্থাৎ অবলোকন নয়, অণুবীক্ষণ? তোমাকে ভিতর থেকে দেখা? রক্তক্ষরণের জায়গায় শুশ্রূষার হাত? এমন বন্ধুত্ব যা ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ? এমন নির্ভরতা যা নিঃসঙ্গতার নিরাময়?

পারব। পারব। আজ এই ভয়ঙ্কর শোকের রাতের অন্ধকারে নতুন করে আবিষ্কৃত হলে তুমি আমার কাছে। কিংবা এর উল্টোটাই হয়ত

আসল। নিজেকেই আবিষ্কার করলাম আমি, তোমার অন্তর্দহনের তাপে। না, এও সত্যি নয় পুরোপুরি।

আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল আমার ব্রহ্মাণ্ড তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ার পর। আমার মাথার চুলে তোমার আঙুল। আল্‌তো ছোঁয়ায় টানছিলে। প্রত্যেকটা টানে সেতারের ঝঙ্কার।

ঐভাবেই বড়, বয়স্ক আর দায়িত্ববান করে তুলেছিল তুমি আমাকে। তুমি বা তোমার অগ্নিস্পর্শ। দুটো শূন্যস্থানের মাঝখানে দাঁড়ানোর যোগ্য হতে হবে আমাকে। স্তালিনের। আর তোমার।

স্তালিন কথা বলতেন বছরে একবার। কখন বলবেন, উৎকর্ণ হয়ে থাকত পৃথিবী। ঠিক সেইভাবেই তখন মনে হচ্ছিল, কলকাতার কালো রাতটা উৎকর্ণ হয়ে আছে আমার মুখ থেকে গভীর কিছু শুনতে চেয়ে।

— কি এত ভাবছ করুণাদি? ভয় পেয় না। আমি তো আছি।

কী আস্তেই না বলেছিলাম কথাটা। অথচ বেজে উঠল দামামায় দামামায়। যেন এক বিশ্বব্যাপী ঘোষণাপত্র, এইভাবে, দফায় দফায়, আগুনের পাকের মত, পাকানো হল্‌কার মত, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল রাত্রির ভিতর, কলকাতার ভিতর, আমার অস্তিত্বের সপ্তসিন্ধুর ভিতর।

অতল জলের গাড়ি

পাতলা হিলহিলে সাপ যেন। সেই রকমই ঠাণ্ডা ছোঁয়া। আরশোলা দেখলে বাড়িতে যেমন তুড়িলাফ, সেই ভাবেই বুবাইয়ের চেঁচিয়ে ওঠা,

—ও মা, আমার পায়ের তলায় জল।

কাচবন্ধ গাড়িটার ভিতরে বুবাইয়ের একার চিৎকার কলের লাটিমের মত এক পাক ঘুরতে না ঘুরতেই মিমিরও প্রায়-আর্তনাদ।

—ও মা, সত্যিই জল ঢুকছে যে।

আরও একটা চিৎকার ওঠার কথা। কিন্তু খেয়ে-দেয়ে আইঢাই শরীর বলে সংঘমিত্রা বসেছিল পা দুটো তুলে না-বসা না-শোয়া এক বিশেষ ভঙ্গিতে। গাড়িতে জল ঢুকতে পারে এটা আগাম আন্দাজ করে নয়, মোটা-সোটা শরীরের আরামের জন্যেই।

—পা তোল্, পা তোল্, পা তুলে বোস্।

ছেলে-মেয়েকে পরামর্শ দিয়ে, নিজের দু'-পায়ের মাঝখানে ঝুলে-পড়া শাড়িটা অনেকখানি উপরে টেনে সংঘমিত্রা সুশান্তকে

—গাড়িতে জল ঢুকছে যে গো!

সুশান্তর গলা যেন বৃষ্টিতে ভিজে নেতানো।

—পা তুলে বোসো সবাই। জল আরও বাড়বে।

—জুতো ভিজে যাচ্ছে যে। কী করব?

বুবাইয়ের নাকি কান্নায় মিমির ধমক।

—এ রকম করে বসো না। আমি ত বসে আছি। বসে জুতো মোজা খুলে নে।

মিমির পায়ে স্যাণ্ডেল। সে জলের ছোঁয়া পেয়েই জুতো খুলে পিছনে মাথার দিকে। মিমির জুতো রাখা দেখে সংঘমিত্রা হঠাৎ তেলে-বেগুনে।

—নিজেরটা রাখলি, আমারটা পড়ে রইল?

মিমি নিচু হতে যাচ্ছিল শালোয়ারের তলাটা গোটাতে। শরীরটাকে বাঁকার ভঙ্গিতে রেখেই মায়ের মুখের দিকে ঘুরিয়ে দেয় ঘাড়টা।

—বলবে ত। আমি কি করে জানব জুতোটা তোমার পায়ে না নীচে?

মায়ের স্যাণ্ডেলটাও খুলে নিয়ে নিজের পাশে। বুবাইয়ের জুতো খোলা হয়ে গেছে। শূন্যে পা রেখে মোজা খুলছিল। খোলা হয়ে গেলে মিমির মত সামনের সিটে পা দুটো ভাঁজ করে টান টান আটকে রাখার চেষ্টা।

—কী করে রাখব? পা নেমে যাচ্ছে ত। মা দেখ, কতটা বেড়েছে জল।

জল বাড়ছিল, কারণ তখনও বৃষ্টি থামে নি আর পা-পা করে এগিয়ে চলেছিল গাড়িটা। আর হাত কুড়ি যেতে পারলেই যখন আমীর আলি অ্যাভিন্যু, তখনই চূড়ান্তভাবে আটকে গেল সুশান্তর হালকা নীল অ্যামবাসাডার।

—য্যা-ক।

স্টিয়ারিং জড়িয়ে থাকা হাত দুটোকে স্টিয়ারিং থেকে খুলে নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে খানিকটা উপরে তুলে তারপর নিজের দুই হাঁটুতে চাপড়ে সুশান্তর গলার ঐ শব্দটা যেন উঠে এল তার কণ্ঠনালী থেকে নয়,

এমনকী তার নিজেরও উচ্চারণ নয় যেন ওটা, যেন সুশান্তর হয়ে প্রক্সি দিলে তার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে জমে-ওঠা অস্থিরতার একটা প্রবল চাপ।

এ রকম ভয়াবহ কোনো সঙ্কটে যে জড়িয়ে যেতে হতে পারে, সেটা অনেক আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিল সে। অনেক আগে মানে, এয়ারপোর্ট হোটেল থেকে বেরোনোর মুহূর্তেই। যতক্ষণ হোটেলের ভিতরে ছিল, বজ্রপাতের শব্দ শুনেছে, বিদ্যুৎ ঝলক চোখে এসেছে, কিন্তু বর্ষণের ধরনটা বুঝতে পারে নি। খাওয়া-দাওয়া সেরে, হোটেল থেকে গাড়ি বের করার সময় এক পলকে জামাপ্যান্টসহ গোটা শরীরটার যখন শাওয়ারে-স্নান, তখনই আতঙ্কটা ব্যাঙের লাফে একদম বুকে।

—মাই গড! বাড়ি পৌঁছতে পারব ত?

সুশান্তর তুলনায় অন্যদের ভেজা প্রায় কিছুই নয়। নিজে পুরোদস্তুর ভিজে গাড়িটাকে সে ব্যাক গিয়ারে নিয়ে এসেছিল হোটেলের গেটে। শরীরটাকে শুইয়ে খুলে দিয়েছিল পিছনের দরজাটা।

সংঘমিত্রা তখনো দেখতে পায় নি সুশান্তর ভিজে যাওয়াটা।

—আমিও কি পিছনে বসব নাকি?

বৃষ্টির ঝমঝমে শব্দে ডুবে গিয়ে সংঘমিত্রা কী বলল কানে আসে নি। সুশান্ত গাড়ির ভিতর থেকে গলা চড়িয়ে

—দাঁড়িয়ে থেকো না। উঠে পড়। সামনে আসতে গেলে ভিজে যাবে।

টাওয়েল নেই। তাই প্রথমে রুমালে। পরে ড্যাশ বোর্ড-এর চৌখুপি থেকে আধ ময়লা একটা হাত-টাওয়েল দিয়ে সুশান্তর মাথা মোছা দেখে, সেই সঙ্গে গায়ে লেপটে থাকা জামাটাও, সংঘমিত্রার ডুকরে ওঠা

—ওমা, একী? এই রকম ভিজে গেছ?

মিমিও আঁৎকে উঠেছিল তখুনি।

—এ কী বাবা? এই জামা পরে থাকবে নাকি? তোমার ত শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

নিজের গায়ের দোপাট্টাটাকে, যেন গা থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছে, এইভাবে

ঝটকা টেনে সুশান্তর দিকে এগিয়ে দেয় সে।

—আরে না, এসব লাগবে না। প্রথম বর্ষা। একটু ভিজলুম। আমার ত ভালই লাগছে।

ভি আই পি রোড পর্যন্ত সন্তর্পণে। যেই না ইস্টার্ন বাই পাস, আর আশাতীত রকমের ফাঁকা রাস্তা, সুশান্ত হয়ে উঠেছিল জেট প্লেনের পাইলট। ঝড়ের বেগে গাড়ি উড়িয়েও ভয় ঘোচে নি হৃৎপিণ্ডের। টানটান টেনশন। একটা সিগারেটের জন্যে জিভের মধ্যে চাতকের ডাক। বুক পকেটেই সিগারেট আর লাইটার। তবু ধরায় নি। সময়টাকে বাঁচানো দরকার। অনেকগুলো পকেট আছে, যেখানে জমে যেতে পারে থৈ-থৈ সমুদ্র। যত দ্রুত পারা যায় পার হতে হবে।

গাড়ির হেডলাইটের এলাকার ভিতরে ঝমঝমে বৃষ্টির ঝকঝকে রেখাগুলোকে একটানা দেখে যেতে-যেতে সুশান্তর মনে হচ্ছিল সে যেন জড়িয়ে পড়েছে বিরতিহীন এক আক্রমণের ভিতরে। ছুঁচের মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ক্রমশই তার চোখে হয়ে উঠছিল কোনো জবরদস্ত কব্জির মোচড়ে ছোঁড়া, ছুঁড়ে ছুঁড়ে যাওয়া, বর্শাফলক। কোনো-এক সময়ে পৃথিবীর আবিষ্কারের ইতিহাস পড়তে গিয়ে তার চোখে পড়েছিল হাওয়াই দ্বীপে ক্যাপটেন কুকের মৃত্যুদৃশ্য। তাঁকে ঘিরে উন্মত্ত আদি-বাসীদের হাতে-হাতে উদ্যত বর্শাফলক। ছবিটা ভেসে উঠল মনে। সুশান্তর গাড়ি চালানোর উন্মাদ বেগে ভয় পেয়ে যায় সকলেই। সুশান্ত স্বাভাবিক ত? নাকি হুইস্কির নেশায় এই রকম?

—কী করছো তুমি? একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে নাকি?

মিমিরও বুক ধুকপুক।

—বাবা, কী করছো? আর একটু আস্তে চালাও না।

ভাল লাগছিল শুধু বুবাইয়ের। বাইরে বেরবার আগেই সে যে ক্যাসেটটা দেখেছে ভি সি আরে, সেখানে যে চেজিং-এর দৃশ্য তার দৌড় এর চারগুণ। বলেও ফেলে কথাটা।

—এ আর কী স্পিড! 'ফ্রেঞ্চ কানেকশন' ত দেখলি না। কাকে

বলে স্পিড দেখতিস।

মিমির হাসিতে ফ্যু ফ্যু শব্দ।

—ফিল্মের স্পিড কি সত্যিকারের স্পিড নাকি? স্লো স্পিডে তুলে হাই করে দেখায়।

বুবুনের স্বভাবে হার মানা নেই।

—তুই সব জানিস! ওটা মোটেই স্লো স্পিডে তোলা নয়। মোটর রেস দেখায় যখন সেগুলোও কি স্লো স্পিডে তোলে নাকি?

—বোকার মত কথা বলিস না ত?

—তুই ত বলছিস বোকার মত।

আজ ছিল বুবাইয়ের জন্মদিন। আজকাল অবস্থাপন্ন বাড়িতে, অন্তত অবস্থার হেরফের ঘটিয়ে যারা হঠাৎ-হঠাৎ নিচুতলা থেকে লিফ্‌টে চেপে উঠে যাচ্ছে আভিজাত্যের উপর তলায়, যেভাবে পালিত হয় পুত্রকন্যাদের বার্থডে অনুষ্ঠান, সেভাবেই ষোলআনা আড়ম্বরে কেটেছে সন্ধে পর্যন্ত। তারপরই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ওরা। আগে থেকেই ঠিক করা, বাইরে খাবে।

—কোথায় খাবে?

ভোট নিয়ে জানতে চেয়েছিল সুশান্ত।

বুবাই—ট্রিংকা।

মিমি—প্রথমে মন্তব্য করতে রাজি না হয়ে, পরে ব্লু ফক্‌স।

সংঘমিত্রা—আমার বাবা বেশ লাগে ওয়ালড্রফ-ই। অনেকটা চেনা হয়ে গেছে।

দুপুর থেকে অসহ্য গুমোট। নিজের কোম্পানিতে নিজের এয়ার-কণ্ডিশণ্ড কামরা থেকে বাড়ি ফিরে সুশান্তর মনে হচ্ছিল যেন ফ্রিজ থেকে ওভেন-এ। সুশান্তকে অঝোরে ঘামতে দেখে রেগে গিয়েছিল সংঘমিত্রা, ফিফটি পার্সেন্ট দরদ মিশিয়ে।

—তোমার কাণ্ডকারখানা বলিহারি! এতজনের জন্যে এত করছ, নিজের জন্যে খরচ করার বেলায় তোমার হাত নড়ে না কেন বলো ত?

হুটপাট করে ভি সি আর না কিনে, তোমার কি উচিত ছিল না নিজের শোবার ঘরটায় একটা এয়ারকুলার লাগানো?

—ও রকম যদি পারতাম, নিশ্চয়ই পারতাম। পারি না বলেই করি নি। যদি এয়ারকণ্ডিশণ্ড চালাতে হয়, গোটা বাড়িতেই চলবে। শুধু আমার ঘরে কেন? ধাপে-ধাপে হবে। একটু ধৈর্য ধর। কোথায় ছিলাম আর কোথায় এসেছি, তুমি ত আর কম জানো না?

—জানি গো জানি। তুমি মানুষটা যে অন্য রকম সে কি আর জানি না? তবু যে বলি, তোমার শরীরের কথা ভেবে বলি। আগে কেরানি-গিরি করতে, সে ছিল একরকম। এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের ব্যবসা। এখন ত বাড়ি ফিরে একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-স্বস্তি দরকার।

তখনকার আলোচনায় সুশান্তই টেনে দিয়েছিল পূর্ণচ্ছেদ।

—হবে, হবে, সব হবে। গাড়ির জন্যে ব্যাঙ্ক লোনটা শোধ হয়ে যাবে সামনের বছরের মার্চে। তারপর পড়ব এয়ারকণ্ডিশনিং নিয়ে।

ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস-এর গলি থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাট রোড পার হয়ে আমীর আলি অ্যাভিনিউ-এ পড়ে পার্ক সার্কাসে পৌঁছবার মুখে সুশান্তর চোখে পড়ে পুব দিকের আকাশে ঘন কালো মেঘ। আরো কিছুদিন কলকাতাকে আগুনের সেঁক-তাপে সিদ্ধ করার মতলবে, আকাশ যেন কলকাতা ছাড়িয়ে দূরের আকাশেই আয়োজন করে চলেছে প্রাণ-জুড়োবার ঘন বর্ষণের। যেদিকে মেঘ সেদিকেই বুঝি এয়ারকণ্ডিশণ্ড পৃথিবী, এই রকম এক আকস্মিক বোধের হলকানিতে বাঁদিকে অর্থাৎ পার্ক স্ট্রিটে যাওয়ার দিকে না বেঁকে সুশান্ত ডান দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল স্টিয়ারিং।

—এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

সংঘমিত্রার প্রশ্নে মিমিও সচেতন তখুনি।

—চায়না টাউনে যাচ্ছ নাকি বাপি?

সুশান্তর বদলে বুবাইয়ের মুখেই লাফানো উত্তর।

—চায়না টাউনে মোটেই না। বাপি যাচ্ছে ক্যালকাটা বোটিং

রিসর্টের ওপেন এয়ারে। তাই না বাপি?

—যাঃ, ওখানে কেউ ডিনার খেতে যায় নাকি?

—কেন যাবে না, খুব যায়।

—সবেতেই তোর আগ বাড়িয়ে পাকামি। বলো না বাপি, কোথায় যাচ্ছ?

—আজ যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে কখনো যাই নি আগে।

—কোথায় বল না তবু।

—এয়ারপোর্ট হোটেলে।

—টসাম্, টসাম্।

ডান হাতটাকে সামনে ছড়িয়ে, যেন হাতে বন্দুক, এইভাবে মুখে গুলি ছোঁড়ার শব্দ করে বুবাই। মনের উপছে-পড়া উল্লাস জানানোর এটাই ওর শ্রেষ্ঠ কায়দা। গোটা সাতেক নানা ধরনের বন্দুক আছে তার। আসল নয় অবশ্যই, খেলনার। ফলে বন্দুকের শব্দ দিয়েই সে বলতে শিখে গেছে জীবনের উল্টো-সোজা সব রকমের অনুভূতি-আলোড়ন।

—আঃ, দারুণ হবে। এরোপ্লেন টেক অফ করছে দেখা হয়ে যাবে। টসাম্, টসাম্।

গাড়িটা ইস্টার্ন বাইপাসে পড়তেই অন্য পৃথিবী। ময়ূরের মত বহুবর্ণ নয় যদিও, কিন্তু ঠিক নাচের আগের ময়ূরের মতই নীলে মেশানো কালো পেখম ছড়িয়ে ডানদিকের প্রকাণ্ড আকাশটা যেন নাচের জন্যে তৈরি। ভয়াবহ, অথচ সুন্দর। ডান দিকে শাক-সব্জির খেতের পর খেত পার হয়ে দূরের যে দিগন্ত, সেখান থেকে এই ইস্টার্ন বাইপাসের সড়ক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে মেঘের ছায়া। যেতে-যেতে রেলগাড়ি হঠাৎ টানেলে ঢুকে পড়লে যেমন, অনেকটা সেই রকমই প্রতিক্রিয়া। হু হু হাওয়ায় ঝড়ের বেগ। নিমেষে গায়ের ঘাম জুড়িয়ে যায় সকলের। ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার মত অগাধ শান্তি চুইয়ে-চুইয়ে ঢুকছে শরীরে। মিমির মুখটা থেকে থেকেই ঢেকে যাচ্ছিল উড়ন্ত চুলের অবাধ্যতায়। চুল সরাতে সরাতে

বিরক্ত মিমি জানলার ডান দিক থেকে চোখ সরায় নি তবু। মেঘের তোলপাড় দৃশ্যটা যতক্ষণ পারে দেখে যাবে সে। গানের বুদ্‌বুদ উঠে আসতে চাইছে তার গলায়। মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে। সৌরভের প্রিয় গানগুলোর একটা। হঠাৎ ময়ুরের মত নেচে-ওঠা হৃদয়টা নিয়ে সে কী করবে ভেবে না পেয়ে সুশান্তর পিঠের দিকে ঝুঁকে, মনের উল্লাসকে টেনে আনে গলায়।

—থ্যাঙ্কিউ বাপি, এমন দৃশ্য দেখি নি কখনো।

সুশান্তর গলা খাদে বাঁধা।

—দেখেছিস। তোর মনে পড়ছে না।

—কবে গো?

—মথুরা থেকে আগ্রা যাওয়ার পথে। নাইনটিন এইট্‌টি থ্রি।

সংঘমিত্রা সুশান্তকে

—ওর কী করে মনে থাকবে? ওর ত তখন জ্বর।

—আমার মনে আছে।

পিংপং বলের লাফ বুবাইয়ের গলায়।

—তোর ত সবই মনে থাকে। বেশি পাকা তো!

—এ্যাই, আজ আমার বার্থ ডে। বকবি না আমাকে।

—তাহলে চুপ করে বসে থাক। সব কথায় ফোড়ন কাটিস কেন?

—মোটেই ফোড়ন কাটছি না। যা দেখেছি, তাই বলছি।

—তোর ত তখন মোটে ছ-সাত বছর। কী মনে থাকবে রে?

সংঘমিত্রা শুধরে দিয়েছিল মিমির ভুল।

—ছ-সাত বলছিস কেন? ওর তখন নয়।

—নয় হোক আর যাই হোক, ওর একেবারে সব মনে আছে?

—খুব মনে আছে। বলব? এই রকম মেঘ। তারপর ঝড়-বৃষ্টি। হেডলাইট জ্বালিয়েও তুমি রাস্তা দেখতে পাচ্ছিলে না। তাই সাইড করে দাঁড়িয়ে পড়েছিলে।

—বলিস কী রে? এত মনে আছে তোর?

—থানডারিং-এর শব্দে ভয় পেয়ে মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। মা ভয় পাচ্ছিল থানডারিং হবে বুঝি আমাদের গাড়ির মাথায়। মা আর বাবা ঝগড়া করছিল।

—বেশ ত, তোর যদি এত স্মৃতিশক্তি, বল ত যেবারে রাজগীরে বেড়াতে যাই, নালন্দায় যাওয়ার পথে কী ঘটেছিল?

—যদি বলতে পারি কী দিবি?

—আগে বল না।

—আমি বলব, তারপর যদি তুই কলা দেখাস?

—দেখেছ মা! ছেলের ভাষা শোনো।

—ওকেই বা তুই ঘাঁটাচ্ছিস কেন?

—আমি ওকে ঘাঁটাচ্ছি? কিসে বুঝলে যে ঘাঁটাচ্ছি। আদর দিয়ে দিয়ে যা পাকাচ্ছ এটিকে!

বুবাই দমে না। তার পড়ার ঘরের দেয়ালে সুপারম্যানদের পোস্টার। আর জাপানি যুযুৎসু খেলোয়াড়দের। আদর্শ ও আরাধ্য পুরুষ ঐসব শক্তিমানেরাই।

—তুই বুঝি পাকিস নি? কচি ট্যাঁড়স হয়ে আছিস এখনো? তোর পাকামির খবর বুঝি জানি না আমি?

—ছ্যাখ বুবাই, বেশি পাকামি করিস না। বাবা দেখছো?

গাড়ি তখন ভি আই পি রোডে বাগুইহাটির কাছে। হঠাৎ বাতাস বন্ধ। তারপরই মেঘের গলায় বাঘের ডাক। একটু পরে টুপটাপ বৃষ্টি।

—হোক বাবা, একটু বৃষ্টি হোক।

সংঘমিত্রার চোখে-মুখে মানত করার ভঙ্গি।

২

স্টিয়ারিং থেকে উপড়ে আনা হাতির শুঁড়ের মত হাত দুটো হঠাৎ এতখানি নিস্তেজ আর অকেজো হয়ে আছে দেখেই যেন সুশান্ত ডান হাতের আঙুলে ভিজে জামার আরো কয়েকটা বোতাম খুলতে খুলতে

বাঁ হাতে ড্যাশ বোর্ড থেকে আধ-ময়লা হাত-টাওয়েলটা নিয়ে পিছনে ছুঁড়ে দেয়।

—বুবাই, পিছনের কাচটা মোছ ত।

না দেখে ছোঁড়া। টাওয়েলটা সরাসরি সংঘমিত্রার মুখে। ঘেন্নায় বিরক্তিতে খেঁচিয়ে ওঠে সংঘমিত্রা।

—আমার মুখেই ছুঁড়ে মারলে ওটা?

—তোমার মুখে? স্যরি ম্যাডাম। কি রে বুবাই, ক্যাচ ধরতে পারলি না?

—আগে বলবে ত।

—একটু থামছে। তাই না রে?

বোতাম খুলতে-খুলতেই সুশান্তর মনে পড়ে যায়, সিগারেট। এক ধরনের টেনশনে জিভের মধ্যে সিগারেটের জন্যে হ্যাংলামি। আবার আরেক রকমের টেনশনে কী রকম বেমালুম ভুলে যাওয়া। ভিজে যায় নি ত প্যাকেটটা? ইস্, আগেই পকেট থেকে বের করে নেওয়া উচিত ছিল।

—হ্যাঁ, একটু যেন কমার দিকে!

সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে

—ভুল হয়ে গেল?

—কী ভুল?

—আমাদের বেরনো উচিত হয় নি। হোটেলে আরো কিছুক্ষণ থাকলেই ভাল ছিল। বুঝতেই পারি নি তো যে, এই রকম বৃষ্টি হচ্ছে। এখন যা অবস্থা, সারা রাত না বসে থাকতে হয় গাড়িতে।

এইটুকু সময়েই হাঁপিয়ে উঠেছে সংঘমিত্রা। খেয়ে-দেয়ে ভরা পেট। গাড়ির ভিতরে হাওয়া নেই। শুধু সামনের সিটের ডানদিকের জানলার পাল্লাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁকা। বাইরে এত বৃষ্টি, তবু ভিতরটা শ্বাসরোধ-কারী। তার উপরে এইভাবে পা তুলে বসে থাকা। সামনের সিটে হাত-পা ছড়িয়ে খুশিমত বসবার নড়বার চড়বার স্বাধীনতা থাকলে তবু

স্বস্তি মিলত খানিকটা। এইভাবে সারারাত? আর ঘণ্টাখানেক কাটাতে হলেই তো হাঁপিয়ে মারা যাবে, এই রকম একটা উদ্‌গত আতঙ্ক তার স্নায়ুর ভিতরে গর্ত খুঁড়তে থাকে তখন।

—বল কী, সারারাত পড়ে থাকতে হবে এখানে?

কথাগুলো বৃষ্টির মতই খসে খসে পড়ে তার গলায়।

—ব্যাক করে, অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে যেতে পার না?

উত্তরটা যাতে সংঘমিত্রা নিজেই খুঁজে নিতে পারে, তাকে অনেক-খানি সময় ছেড়ে দিয়ে সুশান্ত সিগারেটের প্যাকেট খোলে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজে গরম তেলের ছিটে। সিগারেট মাত্র একটাই। হাঁদামি। পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল হাঁদামি আমার। হোটেলেই খেয়াল করা উচিত ছিল। পাওয়া যেত তখুনি। এমন কিছু ড্রিঙ্ক করি নি যে বিবেচনাবোধ ঘণ্ট পাকিয়ে যাবে। তাহলে ভুলটা করলাম কী করে?

—ব্যাক করে?

সুশান্তর গলায় তার হঠাৎ তেতো-হয়ে-যাওয়া মনের বিরক্তি।

—পিছনে তাকিয়ে দেখেছ?

সুশান্ত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে। ইচ্ছা-আবেগের ভিতরে হ্যাম-লেটের দ্বিধা। এখুনি এটা খাবে কি খাবে না।

—কেন, পিছনে কী?

সংঘমিত্রার পিছনে তাকানোর ক্ষমতা এবং ইচ্ছা দুটোই ভোঁতা।

—নিজের চোখে দেখতে অসুবিধেটা কোথায়?

বুবাই জানলার কাচে জমে-ওঠা জল-স্বেদের উপর আঙুল দিয়ে লিখছিল নিজের নাম। মিমি তাকিয়েছিল বাইরে। বন্ধ কাচ আর বৃষ্টির পর্দায় ঢাকা বাইরের দৃশ্যটা তখন তার কাছে অনেকটা পেনটিং-এর মত। ঠিক কার পেনটিং-এর সঙ্গে মিল, সেটাই মনে মনে হাতড়াচ্ছিল সে। বাবার শেষ কথাটায় ঘুরে মায়ের দিকে

—পিছনে গাড়ির পর গাড়ি মা।

—তাহলে কি সত্যি সত্যি সারারাত এই গাড়ির মধ্যে পড়ে থাকব নাকি ?

—তুমি না অল্পেই বড্ড অস্থির হয়ে ওঠো। বৃষ্টিটা ত ধরে আসছে একটু-একটু করে। বৃষ্টি থামলে তবে তো জল নামবে। একটু তো থাকতেই হবে।

—কখন বৃষ্টি থামবে তার ঠিক আছে নাকি ?

—থামবে, থামবে, এখুনি থামবে। আমরা তো আর একা আটকে নেই। শয়ে শয়ে গাড়ী আটকে আছে।

—কী দরকার ছিল ?

—কীসের ?

—ওখানে, অত দূরে খেতে যাওয়ার ?

—এয়ারপোর্ট হোটেলের কথা বলছো ?

—ঘরের কাছের পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে ?

—তোমার ভাল লাগে নি এয়ারপোর্ট হোটেল ? পার্ক স্ট্রিটের চেয়ে ভাল লাগল না তোমার ? কত স্পেশাস। কত পরিচ্ছন্ন। পার্ক স্ট্রিটে ঢুকলে ত মনে হয় খাঁচায় ঢুকলুম।

—আগে ত তোরাই লাফাতিস পার্ক স্ট্রিটের জন্যে।

—এখনও লাফাব। আমি কি বলেছি নাকি যে পার্ক স্ট্রিটে খাব না কখনো ? কমপারেটিভলি কোনটা বেটার সেটাই বলছিলুম।

—তোমরা একেবারে সব বুঝে গেছ এই বয়সে।

—তুমি এভাবে কথা বলছ কেন ?

—কীভাবে বলব আবার ?

—এতে রাগের কী আছে ? কার উপর রাগ করছ তুমি ? এটা ত একটা অ্যাকসিডেন্ট।

—আমাকে আর বকাস না ত! মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

বৃষ্টি ধরার মুখে। সিটের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে বাঁ দিকের জানলার কাচটা অনেকখানি নামিয়ে দেয় সুশান্ত। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ার

ঝলক। সামনেই ফুটপাত। ঘাড় ঘুরিয়ে ছুদিকে যতটা দূর দেখা যেতে পারে, দেখে নেয়। না, সিগারেটের দোকান নেই একটাও। তাহলে এখন থাক। গাড়ি চলতে শুরু করলেই ধরাব। সুশান্ত শোয়ানো শরীর গুটিয়ে আবার নিজের জায়গায়। জানলাটা খোলাই রাখে। একটু বাতাস ঢুকুক।

একটু পরেই জলের উপর সাঁতার কাটার শব্দ। দূরে বেশ কয়েকটা গাড়ির হর্ন। সুশান্ত শব্দ শুনেই বুঝতে পারে, ছেলে-ছোকরারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। গাড়ি ঠেলবে। ওরা জানে কী রকম বৃষ্টি হলে কতগুলো গাড়ি আটকাবে। জলের পরিমাণ দেখে ওদের টাকার অঙ্কের ওঠানামা।

সুশান্তর বাঁ দিকের জানলার কাছ দিয়ে যারা বকের ভঙ্গিতে জল ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে দূরে, অর্থাৎ সামনের দিকে, আবার সিটের ওপরে শুয়ে জানলার কাছাকাছি মুখ এনে তাদেরই একজনকে ডাকে সে।

—এই যে ভাই, শোনো-ও-ও।

এক পলকের জন্যে জানলার ফ্রেমে আটকে যায় ভিজে আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একটি রোগা কিশোরের অবয়ব।

—সিগারেট এনে দেবে ভাই এক প্যাকেট ? তোমাকে আলাদা পয়সা দেব।

—এখন উসব হবে নি।

ঝটকা বেগে ছেলেটি জানলার ফ্রেম থেকে সরে যায়। সিগারেট-হীনতার বিস্বাদ জিভ থেকে মাথায় চড়ে বসে যেন তখুনি। নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার জন্যে সুশান্ত কথার ছল খোঁজে।

—তিতির, মিমি, সব তৈরি হও।

কথাটার মানে বুঝতে পারে নি কেউ। সবাই চমকে সুশান্তর দিকে। সুশান্ত কী দেখতে পেয়েছে একটা ছুটো গাড়ি চলতে শুরু করেছে দূরের ? সংঘমিত্রা কাত করে রাখা শরীরটাকে ঈষৎ সোজা করে।

—ছেড়েছে ?

—ছেড়েছে ? ছাড়তে এখনো ছু'-ঘণ্টা।

—তাহলে তৈরি হতে বললে কীসের জন্যে ?

—গাড়ি ঠেলার জন্যে।

—কারা গাড়ি ঠেলবে ? বুবাই আর মিমি ? এই পচা জলে নেমে ?

—তাতে কী হয়েছে ? নিজেদের গাড়ি নিজেরা ঠেলবে, অসুবিধেটা কী ?

—বুবাইয়ের সক্কাল হলে ইস্কুল। যদি জ্বর-জ্বালা বাধিয়ে বসে, সামলাবে কে ?

—কিছু হবে না। বেশি আতু-পুতু করে রাখলেই বরং ব্যামো বাড়ে।

বুবাই প্রস্তুত। আঃ, জলে নামতে পারলে দারুণ অ্যাডভেঞ্চার।

—এখনই নামব বাবা ?

—না বুবাই, তুমি একদম পা ঠেকাবে না পচা জলে।

—পচা জল, পচা জল, করছ কেন। জলটা পচল কখন ? এই ত পড়ল আকাশ থেকে।

বুবাই বয়স্কের ভঙ্গিতে হাসে। মিমির চোখে ঝাঁঝালো বিরক্তি, মায়ের কথা বলার অনর্থকতায়। এক আঙুলের পালিশ-করা নখ দিয়ে আরেক আঙুলের নখের কী যেন লেগে থাকা তুলতে তুলতে

—গাড়ি বুঝি আমরা আগে ঠেলি নি কখনো ? গত বারে পুজোয় দীঘা যাওয়ার সময় ?

—সে আলাদা। সেটা ছিল ডাঙা। এটা পচা জল। সাত রাজ্যের নোংরা ভাসছে। সাপ খোপ উঠে আসতে পারে।

—তাহলে লেক টাউনের বাড়িতে ছিলে কী করে। সেই ৭৮-এ ?

সুশান্তর গলায় বেশ ভরাট জিজ্ঞাসা। কারণ অন্যমনস্কতার ঘোরে হিশেবে-কষে-রাখা সময়ের আগেই ধরিয়ে ফেলেছে সিগারেটটা।

—তখন ত তেইশ দিন কেটেছে পচা জলে। এক গলা পচা জল ডিঙিয়ে ওরা গেছে স্কুলে, আমি গেছি চাকরিতে।

—সে বাদ দাও। তখন তো আর উপায় ছিল না।

সুকান্ত বেশি কথা বলে সিগারেটের মৌতাতটাকে মাটি করে দিতে চায় না বলেই চুপ। তখন বাবার বদলে মেয়ে।

—তোমার না মা, সব কিছুকে বেশি বেশি করে ভাবা একটা বদভ্যেস।

—তুই থাম ত। তোকে আর অত ব্যাখ্যা করতে হবে না।

—আর একটা বদভ্যেস হল, বাবা যা বলবে, তার উলটোটা বলা।

—চুপ কর মিমি, অত জ্ঞান দিতে হবে না তোমায়।

—জ্ঞান দিচ্ছি নাকি, যা দেখি তাই বলছি।

ব্লাডপ্রেসারের রুগি। হার্টের পেশেণ্ট। হঠাৎ তাই মাথায় আগুন। মাথার আগুন দপ্‌দপিয়ে উঠতেই সংঘমিত্রার গলার স্বর সপ্তকে।

—কী দেখিস তুই? তুইই শুধু দেখিস আমাকে? আমি আর তোর কিছু দেখি না? বাপি বাপি করে বাবার মন ভিজিয়ে তুমি গোপনে কী করে চলেছ তা জানতে আমার বাকি নেই। আমাকে ঘাঁটাস না। সকলের সব কথা বলি যদি, বুঝবি তোদের এই মা-র সইবার ক্ষমতা কতখানি। বুঝলি?

কথা শেষ করেই হাঁপানি। বুকের আইঢাই তোলপাড়। মিমি সে তোলপাড়কে থামতে দেয় না।

—কী দেখেছ বলেই ফেল না। বাপিও শুনুক।

—তুই তোর প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে কী করিস?

—আন্‌কমন কিছুই করি না। অন্যায়ও করি না কিছু?

—তাহলে দরজা ভেজিয়ে রাখিস কেন?

—অমন করে চেঁচিয়ে কথা বলো না মা। চেঁচিয়ে কথা বললেই সব সত্যি হয়ে যায় না। দরজা ভেজাই একদিকে টিভি আরেক দিকে বুবাইয়ের পড়ার ঘরের চিৎকারের জন্যে।

—আর কিছু বুঝি চোখে পড়ে নি আমার?

—পড়লেও সেটা দোষের নয়। তুমি যা ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশি ইনটিমেট সম্পর্ক সৌরভদার সঙ্গে আমার।

—লজ্জা করে না তোর অমন গা ঢলাঢলি করতে?

—না। করে না। কারণ ওকেই তো বিয়ে করব।

বেশ কিছুক্ষণ মুখের হাঁ-টা বোজাতে পারে না সংঘমিত্রা। মাথায় আগুন চোখে। চোখের কটকটে আগুনেও ঘাড়-বাঁকানো মিমির চামড়ায় ছ্যাঁকা পড়ছে না দেখে সুশান্তর দিকে ঘুরে।

—শুনছ? মেয়ের কথা শুনছ?

—হুঁ।

—কাকে বিয়ে করবেন সেটা উনি নিজেই স্থির করে ফেলেছেন।

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ মানে কী? বাবা-মার মতামত না নিয়েই নিজের গার্জেন হয়ে উঠবেন নিজে?

সংঘমিত্রা যেন শক্তিশেলের ঘা খাওয়া লক্ষ্মণ। মেয়ের কাছে তর্কে হেরে-যাওয়াটা সহ্য করতে না পেরে গোটা শরীরে অস্থির মোচড়। এতক্ষণ বসেছিলেন মেয়ের গা ছুঁয়ে। অমন অশুচি মেয়েকে ছুঁয়ে থাকা পাপ, অবিকল এই রকম মনোভাবে নিজের হৃষ্টপুষ্ট শরীরটা গুটিয়ে নেন একপাশে। মেয়েকে ছেড়ে তাঁর আক্রোশ তখন সুশান্ত দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

—তুমিও চুপ করে শুনে যাচ্ছ সব?

আর মাত্র একটা টান দিলেই শেষ হয়ে যাবে সিগারেট। সুশান্তর সমস্ত মনোযোগ তখন ঐ শেষ টানের দিকে। যেন আজকের এই সমস্ত রকম বিশৃঙ্খলা বিপত্তির বিপরীতে এই শেষ টানের সুখ-স্বাদ। হয়ত-বা এতসব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের রণাঙ্গনে প্রতিরোধ-প্রতিরক্ষার শক্তি-সাহস-শৌর্যে নিজেকে অবিচলিতরূপে প্রস্তুত করার জন্যেই শেষ টানটুকুকে জীবনদায়ী কোনো মহৌষধের মতই তার একান্ত প্রয়োজন। একেবারে ফিলটারে পৌঁছে গেছে দেখে জানলার কাচের সরু ফাঁক দিয়ে সিগারেট গলিয়ে দেয় সে।

—কী গো, তোমার কানে ঢুকছে না বুঝি কিছু?

—সমস্যাটা কী? গাড়ির মধ্যে এখন এইসব বিষয় তোমাদের আলোচনার?

—আমি তো তুলি নি এত কথা।

—তাহলে কে তুলল?

—কে তুলল শোন নি?

—শুনেছি।

—তাহলে চুপ করে আছ কেন?

—বাড়ি তো আছে। সেখানে গিয়ে বলা যায় না এসব?

—তা বলে গাড়িতে বসে কেউ যদি আমাকে অপমান করে, গাড়িতে তা নিয়ে কথা বলা যাবে না?

—বড্ড বাজে তর্ক হয়ে যাচ্ছে। চুপ কর তো। তুমি যা বলবে, সব জানি আমি।

—জানো? তোমার মেয়ে তার প্রাইভেট টিউটরকে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে, সেটা জানো?

—প্রাইভেট টিউটার কি বামুন-কায়েত চাঁড়ালের মত আলাদা কোনো জাত নাকি? তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বোলো না।

—না আমি কিছু বুঝি না। না বুঝে ঘাসে মুখ দিয়ে চলি। ঘাসে মুখ দিয়ে তোমাদের সংসারটাকে ধরে আছি।

—তুমি কি একা ধরে আছ নাকি? তোমাকে সাহায্য করার ঝি-চাকর-রাঁধুনি-টাঁছুনি কেউ কোথাও নেই বুঝি?

—তা থাকবে না কেন? সে না হয় দু'-বছর হয়েছে। নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর। তার আগে লেক টাউনের দেড়খানা ঘরে ছিলে যখন, কটা ঝি-চাকর রেখেছিলে তখন?

—সামর্থ্য ছিল না রাখতে পারি নি। তখন চাকরি করতাম। তোমাকে সুখে রাখতে পারি নি। এখন ব্যবসা করছি। পারছি। এই তো সোজা কথা। মিটে গেল।

—না মেটে নি। চাকরির সব টাকা যদি সংসারে ঢালতে, তাহলে

আর অকালে উনোনে-ধোঁয়ায় চুল পাকত না আমার।

—তাহলে কোথায় ঢেলেছি? রেসের মাঠে?

—আর একটা মেয়েমানুষের পিছনে। তোমার ছেলেমেয়েরা জানে না সেসব। আজ জানুক।

—তুমি কি ভাবছ, ছেলেমেয়েদের সামনে এসব বললে লজ্জায় কুঁকড়ে কেঁচো হয়ে যাব আমি? আমার নিজেরই ক্ষমতা আছে ওদের কাছে সমস্তটা বলার। বলতে গিয়েও বলি নি, কারণ ওরা সবটা বুঝতে পারবে না। আজকের কমিউনিস্ট পার্টি দেখে এরা বুঝতেই পারবে না, আমাদের ছাত্রজীবনে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পিছনে ছিল ঠিক কী ধরনের অগ্নিপরীক্ষা। যখন প্রেসিডেন্সি জেলে, বাবা মারা গেলেন দেশের বাড়িতে, মেদনীপুরে। জেল থেকে বেরোবার পর জানতাম লেখাপড়ার এইখানে ইতি। বাড়ি থেকে টাকা না এলে মেসে থাকা যাবে না। জেলে আমাদের দীক্ষাদাতা ছিলেন হীরেনদা। জেল থেকে বেরবার পর সেই হীরেনদাই জুটিয়ে দিলেন একটা টিউশনি। শুধু টিউশনি নয়, যে বাড়িতে টিউশনি, সেখানেই এক চিলতে ঘরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। একটা কমিউনিস্ট পরিবার। নিম্ন মধ্যবিত্ত। নিজেরাই এক হাঁটু দুর্দশায়। তবু আমাকে এম. এ. পর্যন্ত পড়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন ওঁরা। এম. এ. পাশ করেই ওখান থেকে চলে আসি। তার কিছুদিন পরেই শুনলাম, রজনীবাবু মারা গেছেন। গোটা সংসারের দায়িত্ব বড় মেয়ে রমলাদির উপর। আমি যে সামান্যতম সাহায্য করব সে ক্ষমতা নেই। টিউশানির টাকায় নিজের খরচটা চলে কোনোমতে। চাকরি পেলাম যখন, তখন থেকেই প্রতিজ্ঞা ওদের কাছে ঋণের বোঝা শোধ করব যতটা পারি। সোজাসুজি টাকা দিতে গেলে রমলাদি খেপে যেতেন। তাই কিনে নিয়ে যেতাম এটা-সেটা। তারপর তোমার সঙ্গে বিয়ে। আমাদের বিয়ের ছ' মাসও পেরোয় নি রমলাদি বাস থেকে পড়ে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বেডরিডন্। বেডরিডন্ বলেই রমলাদি টের পান নি, যখন যা ওষুধ লাগত তার অনেকখানি খরচ জুগিয়ে গেছি গোপনে।

তোমার কাছে গোপন করিনি কিছুই। এমনকি যাতে তুমি সত্যিকারের বাস্তব চেহারাটা বুঝতে পার, বিছানায় পড়ে থাকা রমলাদিকে দেখাতেও নিয়ে গিয়েছিলাম একদিন। তা সত্ত্বেও তোমার মাথায় গেঁথে বসে গেছে ভিন্ন এক ধারণা। মেয়েমানুষের পিছনে টাকা ঢালা। তোমার দোষ নেই। এখনকার জল-হাওয়া অন্যরকম। এমনই অন্যরকম যে স্বাধীনতা পাওয়ার আগের রশিদ আলি দিবসের কথা বাদ দাও, এই ত সেদিনের ট্রাম আন্দোলন, তখনকার ত্যাগ কিংবা সংগ্রামের আন্তরিক কাহিনী এখনকার জেনারেশনের কাছে মহাভারতের যুগের মত বাসি, পচা, টক্‌চা দইয়ের মত জিভে ছোঁয়ানোর অযোগ্য। রমলাদি মেয়েমানুষ ঠিকই, কিন্তু ঐ রকম কিছু মেয়েমানুষ সেই দীনেশের বৌদির আমল থেকে বাংলার ঘরে ঘরে ছিল বলেই স্বাধীনতা আন্দোলনের আগুন জ্বালাতে পেরেছিল আমাদের দেশ।

একটা সিগারেট থাকলে ভাল হত। সুশান্তর মধ্যে কথা বলার আবেগ বর্ষার মেঘের মত পাকিয়ে উঠছে। এই ভাল হয়েছে। বাড়িতে, বাড়ির উজ্জ্বল আলোর প্রখরতার নীচে এভাবে কথা বলতে পারত না সে। বেশ বলা যেতে পারছে এই দুর্যোগের মধ্যে গেঁথে গিয়ে। একটা সিগারেট থাকলে হয়ত আরো গুছিয়ে, অন্তঃশীল অনুভূতির তলদেশ থেকে তুলে এনে, নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতে পারত আরো।

—মিমি?

—বাপি?

—দীনেশের নাম শুনেছ কখনো? জান, দীনেশ বলতে কাকে বোঝালাম?

—মনে পড়ছে না।

—বুবাই, তুমি বিবাদী বাগের নাম শোনো নি?

—হ্যাঁ, ঐ ত ডালহৌসী স্কোয়ারে।

—কী মানে কথাটার?

—একটা জায়গার নাম।

—তোমাদের ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলে শেখায় নি বুঝি এসব ?

—কোনটা ?

—বিবাদী এই তিনটে অক্ষরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের কোন তিনজন সৈনিকের বা শহিদের নাম গাঁথা ?

—কাদের বাপি ?

—তোমরা কোনোদিনই এদের জীবনী পড়বে না জানি। তবু নামটা শুনে রাখ। বিনয় বাদল দীনেশ। বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত।

—ও, তুমি ঐ দীনেশের কথা বলছিলে ?

মিমির মিয়োনো গলা এতক্ষণে তাজা।

—প্রথমে বুঝতে পারি নি। আমি জানি। সৌরভদার মুখে শুনেছি। রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ ত ?

—সৌরভ বলেছে তোমাকে ? সৌরভের বয়সী ছেলেরা এসব নিয়ে আলোচনা করে এখনো ? সৌরভ অবশ্য করবেই। রমলাদির ছোট ভাই বলে নয়, ওর বাবা এদেশের গোড়ার যুগের কমিউনিস্ট কর্মী। ট্রেড ইউনিয়নিস্ট। রমলাদি মারা গেছেন। সৌরভকে তোর প্রাইভেট টিউটর করে দিয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি। দু-ধরনের প্রায়শ্চিত্ত। এক, রমলাদিদের পরিবারের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের দিক থেকে। দুই, আমার ব্যবসা আমাকে যে অলমোস্ট আনঅ্যান্টিসিপেটেড অ্যাফ্লুয়েন্সের দিকে টেনে চলেছে, তারও।

৩

কাছে দূরে হঠাৎ অজস্র হর্ন। ভূমিকম্পের সময়ের শঙ্খধ্বনির মতই যেন। সুশান্ত জানে, তার গাড়ি স্টার্ট নেবে না। সামনের গাড়িটা মারুতি। মারুতির ডিসট্রিবিউটার অনেক উপরে। সেখানে জল ঢোকে নি। তারটায় অবধারিত ঢুকেছে। তবু, যদি দৈবক্রমে না ঢুকে থাকে, ব্যস্ত হয়ে চাবি ঘোরায়। না। স্টার্ট নেয় না। গাড়ির হর্ন। দূরের দূরের গাড়িতেই বেশি। তার মানে জল নেমেছে। অথবা কোনো রাস্তা-

আটকানো খোঁড়া গাড়িকে সরানো গেছে এতক্ষণে।

এক ঝটকায় ডান দিকের দরজা খুলে জলে নেমে পড়ে সুশান্ত। নামবার পরে খেয়াল হয়, জুতো মোজা খুলে, প্যাণ্ট গুটিয়ে নামা উচিত ছিল তার। নেমে দেখল, প্যাণ্ট গুটিয়ে তার মতই নেমে পড়েছে অনেকে।

—এই যে, এ্যাই যে, ও ভাই, এদিকে, এখানে, শুনছ ও ভাই···

যারা গাড়ি ঠেলার জন্যে এদিকে-ওদিকে ব্যস্ত, তাদের উপলক্ষ করে শূন্যে নিজের ডাকাডাকিটা ছুঁড়ে দেয় সুশান্ত। ডাকতে ডাকতে অনেকটা দূরে চলে যায় সে। বুবাই জানলার ধারে। জানলাটা পুরো খুলে দিয়ে গলা বাড়িয়ে বাবাকে দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে আর দেখতে পায় না।

সুশান্তর নেমে যাওয়ার পর সংঘমিত্রার মাথায় আগুন নিভতে থাকে। মিনিট পাঁচেক পরেও তার গলার সাড়া বা তার ফিরে-না-আসায় সংঘমিত্রার ভিতরে উদ্বেগের কামড়। যে-মানুষ নিজেকে নিয়ে এত কথা বলে নি আগে কখনো, বলতে বলতে বুকের খানা-খন্দ ঝাঁপিয়ে-ওঠা কোনো অভিমানের জলস্রোত তাকে অন্য কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি ত?

সংঘমিত্রা বুবাইয়ের দিকে ঘোরে।

—অ বুবাই

—একটা গাড়িতে আবার কুকুর।

—অ বুবাই

—বাবার মতই জুতোসুদ্ধ নেমে পড়েছে আরেকজন।

—অ বুবাই

—কি্য?

—তোর বাবা কোথায় গেল? একবার দেখবি নাকি?

—বাঃ, একটু আগে ত তুমিই বলছিলে পচা জল। নামলে জ্বর-জ্বালা হবে।

—সে তখন বলেছি, বলেছি। মাথা দপ্‌দপ্‌ করছিল।

—বাবা কি ছেলেমানুষ নাকি, যে হারিয়ে যাবে? লোক ডাকতে গেছে।

—ত ফিরছে না কেন। ঐ ছ্যাখ। সামনের গাড়ি এগোচ্ছে একটু একটু।

—লোক নিয়ে ফিরবে। ঠেলতে হবে ত।

—কেন, এমনি চলবে না?

—দেখলে না, বাবা চাবি ঘোরাল। ভোঁভা।

—তাহলে ঠেলে ঠেলে কি ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনে নিয়ে যাবে নাকি?

—ওঃ মা, কী যে আনাড়ি তুমি! ঠেলে জল থেকে তুলে দেবে। তারপর এঞ্জিন গরম করতে হবে জল বের করে। তারপর চলবে।

—সে ত অনেক সময়···

—এঞ্জিনে জল ঢুকে গেলে···

তিতিরের কথার মাঝখানেই বাঁদিকের জানলার কাছে সুশান্ত। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। একটু পরে একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে আধবুড়ো একজন।

—তোমরা এই রিকশায় বাড়ি চলে যাও।

—সে কী? আমরা যাব। তুমি?

—আমি গাড়ি সাইড করে তারপর যা করার করে ফিরছি।

রিকশাওয়ালার চেহারা দেখে ভয় পায় সংঘমিত্রা। নিজের শরীরের ওজন তার জানা। সে ছাড়াও বুবাই আর মিমি। এই রকম সিড়িঙ্গে চেহারার বুড়ো বইতে পারবে নাকি জল ঠেলে ঠেলে? কোনো গর্তে পড়ে ভেঙে যায় যদি রিকশাটা? এগুলোও যথেষ্ট বড় কারণ তার ভয় পাওয়ার। কিন্তু রিকশায় ওঠার অনিচ্ছা ঘোষণার সবচেয়ে বড় কারণ অন্য। মিমির সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে সে যেতে পারবে না আজ। পরে হয়ত পারবে। নিজের মেয়ের গর্বিত ভঙ্গির বোলচাল হজম করে নিজের ভিতরের অপমানবোধ আর হেরে-যাওয়ার গ্লানি ধুয়ে-মুছে সাফ করতে একটা ছুটো রাত লাগবেই তার।

—তুমি একা পড়ে থাকবে, আমি কী করে যাব?

—আমার সময় লাগবে। রাস্তায় গাড়ি ফেলে রেখে ত আর

ফিরতে পারব না।

—সবাই একসঙ্গেই ফিরব।

—তা কখনো হয় নাকি? আমার অনেক সময় লাগবে। ভিজে এঞ্জিন গরম হবে, তারপর। ঘণ্টা দুয়েক ত লাগবেই।

—দু' ঘণ্টা পরেই ফিরব তাহলে।

—দু' ঘণ্টাতেই যে স্টার্ট নেবে তার কি মানে আছে?

—তুমি কি তাহলে সারারাত জলে পড়ে থাকবে নাকি?

—থাকতে হলে, থাকতে হবে। তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের একদিন ভুগতে হলে, না ভুগে উপায় কী? শুধু ত আর আমি ভুগব না। বাইরে বেরলেই দেখতে পাবে। জখম হয়েছে কতগুলো গাড়ি। আর এরাও এই তালে দর হাঁকাতে শুরু করেছে আকাশ ছোঁয়া। এখান থেকে ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস যাবে, চাইছে কত জান?

—কত?

—আশি টাকা।

—ওমা, আশি টাকা? এইটুকুনি যেতে?

—তাও হাতে-পায়ে ধরে এনেছি।

বুবাই গলা বাড়িয়ে দেয় কথার মাঝখানে।

—দেখছ ত, মারুতিগুলো চলছে। আমি ত মারুতিই কিনতে বলেছিলাম তোমাকে। তুমি ইচ্ছে করে কিনলে না।

—ইচ্ছে করে কিনলাম না মানে?

—আমি বলেছি বলে কিনলে না। দিদি বললে, কিনতে।

একা একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল সুশান্তর। রমলাদির কথা বলতে গিয়ে তার জীবনের অতীতকালটা সিনেমা হয়ে উঠছিল স্মৃতিতে। আরেক বার সে ফিরে যেতে চায় সেই পুরনো মানচিত্রে। কারখানা, ব্যবসা, একস্‌পোর্ট সুনিশ্চিত সব সার্থকতার ধাপ ধাপ সিঁড়িগুলোকে নির্মাণ করে চলেছে একের পর এক। কবেকার ফিকে-হয়ে-যাওয়া অতীতকাল এই সব ঊর্দ্ধগামিতাকে

তুচ্ছ করে দিয়ে হঠাৎ গণনাট্যের কোরাস গানের মত, য়ুনিভার্সিটির গেটের পিকেটিং-এর সমুদ্রে মাতাল নৌকো হয়ে ভেসে চলার মত উজ্জ্বল-উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে চেয়ে তার অস্তিত্বের কাছে প্রার্থনা করে চলেছে গভীর একাকিত্বের। বুবাইয়ের কথাবার্তার এঁচড়ে-পাকামি চরিত্রটা তার কাছে নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। হয়ত সে, তার ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার অগোচরেই, কোনো না কোনোভাবে, ডিমে তা দেওয়ার মত, প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে ওদের এইভাবেই নষ্ট হয়ে যেতে। নষ্ট কিনা তাই বা কে জানে। এমনও ত হতে পারে যে, আগামী কালের পৃথিবীর জন্যে বুবাইয়ের মত শিকড়হীন শ্যাওলারাই সবচেয়ে বেশি উপযোগী! হতে পারে। হতে পারেও যদি বা, তবুও সুশান্তর মনে হল তার অতীতমুখী স্মৃতি-অভিযানের তীব্রতর অভিপ্রায়কে বুবাইয়ের বাচালতাই যেন নোঙরে টেনে রাখতে চাইছে সাম্প্রতিকতার ডাঙায়।

সুশান্ত সচরাচর রাগে না। ছাত্রজীবনে রেগে যেত। অতি অল্পেই বারুদে আগুন। এখন কষ্ট করে শিখতে হয়েছে না-রাগার সুস্মিত শিষ্টাচার। কারণ সে একটা কারখানার মালিক। কারখানায় ইউনিয়ন। ছোট কারখানা বলে ছোট ইউনিয়ন। কিন্তু ছোট ইউনিয়ন বলে দাবি-দাওয়ার বহর ছোট মাপের নয়।

সচরাচর না-রাগা সুশান্ত এই মুহূর্তে হঠাৎ ফেটে পড়ল রাগে। প্রায় স্থান-কাল ভুলে গিয়ে তার গলায় এক আদিম চিৎকার।

—ইউ আর বিকামিং এ স্টুপিড, ডে বাই ডে।

সংঘমিত্রা, মিমি, বুবাই তিনজনেই চমকে ওঠে। আলাদা করে প্রত্যেকেই ভাবে, সুশান্তর এই কঠোর সম্ভাষণ বুঝি তার উদ্দেশেই। তবুও, বাবা তাকে কখনোই এ-ভাবে বলতে পারে না এই রকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই বুবাই প্রশ্ন করে বসে

—কে বাপি? কাকে বলছো?

আগের চেয়েও আরও হিংস্র শোনায় সুশান্তর উচ্চারণ।

—ইউ, ই-উউ।

সুশান্তর চিৎকারের ধাক্কা বুড়ো রিকশাওয়ালার গায়েও আছড়ে পড়ে যেন খানিকটা। সুশান্ত থামতেই

—আপনারা যাবেন ত চলুন। না হলে ছেড়ে দিন আমাকে। অনেক খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে।

সুশান্তের ভিতরে রাগের ইঞ্জিনটা গরগরিয়ে স্টার্ট নিয়েছে। থামানো অসম্ভব। তাই রিকশাওয়ালাকেও

—না, কেউ যাবে না, তুমি যাও।

রিকশাওয়ালা উলটো দিকে ঘোরার জন্যে বেঁকেছে মাত্র, তখনই আবার আগের মতই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি।

সুশান্ত লাফিয়ে গাড়িতে। খোলা জানলাগুলো বন্ধ হতে থাকে ঝট্‌পট্।

আফ্রোদিতির ভগ্নাংশ

বসুধা জিন, ভাস্কর হুইস্কি। বসুধা খাচ্ছিল চেখে চেখে। যেন টক-ঝালের চাটনি। পার্টি-ফার্টিতে যেতে হচ্ছে আজকাল স্বামীর হঠাৎ পশারের দৌলতে। বেসামাল হয়ে সিন ক্রিয়েট করার উদ্বেগেই তার এই সতর্কতা-ময় অভ্যেস। ভাস্কর উল্টো। যে গতিশীলতা তার জীবনের মোটো, পানাহারের বেলায়ও সেটা ব্যতিক্রমহীন। চারের পর পাঁচের অর্ডার দেওয়ার জন্যে সে যখন বেয়ারাকে ডাকছে টেবিলের কাঁচে চামচের আওয়াজে, বসুধার বাঁ দিকের গালে কার যেন বরফে-ডোবানো হাতের ছ্যাঁকা। চমকে ঘুরে বুঝতে পারে ব্যাপারটা। এক পলকের জন্যে বাঁ-দিকের কাঁচের দরজাটা খুলেছিল কেউ। তাতেই কনকনে ভিজে হাওয়ার ঝাপটা। বসুধা এখন সেই বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়েই মনে মনে হিসেব কষে বাইরের বৃষ্টির মাপজোপের, সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ভাস্করের দিকে তাকিয়ে গলায় টেনশন এনে

—এ্যাই, শোনা-ও-ও—

ভাস্কর তখন ওয়েটারকে—

—দো বড়া পেগ।. মেমসাহেবকো জিন, আউর হামারে লিয়ে—

বসুধার গলায় ঝোড়ো হাওয়া।

—এ্যাই কি করছো? নো। ন্যো মোর। সত্যি আর খাব না।

ভাস্কর তার ঠোঁটের একদিকে হলিউডি হাসি টেনে আনে। সরু গোঁফটা বাঁকে।

—ওকে, ওকে, দিসিজ লাস্ট। ফর দা রোড···

বসুধার গলায় তখনও ঝোড়ো হাওয়ার ঝাঁজ।

—ফর দা রোড? বাইরে কি চলছে দেখেছ?

বেয়ারা চলে গেছে ভাস্করের হাতের ইশারায়। টেবিলে ছড়ানো সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ঠোঁটের কোণে আলতো লাগিয়ে সোনালী লাইটারটাকে খট্ করে টিপতেই নীল আগুন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পাশের খালি চেয়ারের উপর হাতটাকে হাতীর শুঁড়ের মতো লম্বা করে দিয়ে ভাস্কর বসুধার দিকে এমন চোখে তাকায়, যেন চোখ দিয়েই বসুধাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে সে।

—বাইরে কি চলেছে? সাইক্লোন?

—কখন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে বল তো?

—হোক্ না, তোমার কিসের ভয়? কলকাতাটা বৃষ্টিতে ভেসে যাক্, তুমি চাও নি?

—চাইবো না কেন? সে তো সকলেই চেয়েছে। তাই বলে এই রকম নন্ স্টপ!

—সো হোয়াট। যতই বৃষ্টি হোক, আমরা তো ফিরবো ইস্টার্ন বাই পাস দিয়ে। শুকনো পথে।

বসুধার ঘ্রাণশক্তি ভিন্ন রকমের। এক পলকের ঠাণ্ডা বাতাসের নমুনা থেকেই সে আন্দাজ করে নিতে পারছে বাইরের বিপর্যয়ের ধরন-ধারণ। আজকের দিনটাই যেন বিপর্যয়ের। গৌহাটির ফ্লাইট ছিল সাড়ে এগারোটায়। লেট, লেট, লেট। ছাড়ল পাঁচটায়। সেই সাড়ে এগারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এয়ারপোর্টে বন্দী। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই গাড়িটা গেল বিগড়ে। তখুনি ভাস্করকে ফোন। ভাস্কর নিজেই

গাড়ি চালিয়ে হাজির। অশোক অবাক। অফিস যাবি না? ভাস্কর অবিচলিত হাসিতে: যাবো। লাঞ্চের পর। তোমাকে তো তুলে দিয়ে আসি প্লেনে। পাঁচটার পর এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার সময়ই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বসুধার কাছে তখনই অনুমতি প্রার্থনা ভাস্করের, একঝসটেড। এয়ার-পোর্ট হোটেলে বিয়ারে একটু গলা ভিজিয়ে না নিলে মরে যাবো। বসুধা গলা খুলে না বলতে পারে নি। বন্ধু হিসেবে এতখানি সময় আর আস্ত একটা গাড়ি দিয়ে সাহায্য করেছে। না বলেনি, কিন্তু প্রশ্ন করে-ছিল, খেলাম তো বিয়ার দুপুরে? ভাস্করের কাঁধ-ঝাঁকানো থিয়েটারি হাসি। দেড় বোতল করে বিয়ার সেই দুপুরে। ঐ নস্যি কি এখনো পেটে আছে নাকি? বিয়ার খেয়েছিল বসুধাও। বোতলের হিসেবে দেড় নয়, গেলাসের হিসেবে দেড়। তারই ঘোর কাটেনি তখনো। আবার হোটেলে যাওয়া কেন? তবুও ভাস্করের সঙ্গে হোটেলে চলে এসেছে সে। বৃষ্টির আগের গুমোটে হাঁপিয়ে উঠেছিল ভিতরটা। সে তো আর বিয়ার গিলতে যাচ্ছে না। চাইছে ঠাণ্ডা ঘরে খানিকটা গা-এলানো বিশ্রাম। বৃষ্টি থামলে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বাড়ি ফেরা যাবে। সাড়ে পাঁচটা থেকে হোটেলে। এখন সাতটা বেজে সাঁইত্রিশ। ঝমঝমে বৃষ্টির যেটুকু দৃশ্য চোখে পড়েছে তার, সে রকম ঘণ্টাখানেক চললে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে পুরীর সমুদ্র। বসুধার বুকের মধ্যে সাইরেন: এবার ওঠো, নইলে পড়বে বিপজ্জনক অবস্থায়।

বসুধার বেয়ারা পুরনো গেলাসে মেপে ঢেলে দেয় নতুন জিন। বেয়ারা চলে গেলে সে গেলাসটাকে ঠেলে দেয় ভাস্করের দিকে।

—আমার আর ভালো লাগছে না ভাস্কর। সত্যি বলছি।

জালের আড়ালে রাখা মাছের মুড়োর দিকে হা-পিত্যেশী বেড়ালের তাকানো নিয়ে ভাস্কর পাশের চেয়ারে ছড়ানো হাতটাকে সরিয়ে টেবিলে এনে, টেবিলের ওপারের বসুধার দিকে ঝুঁকে

—তুমি কি একদিনের জন্যে অন্য রকম হতে পার না মিলি?

মিলি? এতো তার গত জনমের নাম। কলেজ-য়ুনিভার্সিটি যুগের।

অশোক এ নাম জানে না। ডাকেও না তাই। কালে ভদ্রে কোন পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে তারাই শুধু ঐ নামে ডেকে য়ুনিভার্সিটির সবুজ লনের ঘাসের উপরে ফেলে-ছড়িয়ে আসা স্মৃতির দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পালক পরিয়ে দেয় তার পিঠে। অনেক আগে, বিয়ের বছর চারেক পর থেকে, অন্যের মুখে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে একদা-অভিন্ন ঐ নাম শুনলে দীর্ঘশ্বাস পড়ত তার। কিন্তু আজ মনে হল ড্রেসিং টেবিলের লম্বা কাঁচে হঠাৎ-ছোঁড়া পাথর। ঝন্ঝন্ ভেঙে পড়ছে গোটা আয়নাটা শত টুকরোয়।

যেন কিছুই ভাঙেনি, পুরোপুরি একটা ঝকঝকে আয়নাই, এইভাবে ভাস্করের দিকে তাকাতে পারবে না জেনেই ঠেলে দেওয়া গেলাসটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে মুখে ছোঁয়ায়।

—কি ?

ভাস্করের তাকানো আঠা দিয়ে আটকানো বসুধার মুখে। একটা গভীর জিজ্ঞাসা চিহ্নের প্রগাঢ় ছায়ায় ভাস্করের মুখটা ধূসর।

—পারবে না ?

—কি পারবো না ?

বসুধার চোখ গেলাসের হালকা-সবুজ জিনের বুদবুদে।

—যা বললাম।

—আমি শুনি নি। তাড়াতাড়ি শেষ করো। আর ভাল লাগছে না বসতে।

—ষোলো বছর পরে আমরা দুজন মুখোমুখি। তোমার মনে পড়ছে না কিছু ?

—কি মনে পড়বে ?

—য়ুনিভার্সিটির দিনগুলো ?

—না। একদম ভুলে গেছি। সেসব কবেকার কথা! মনে থাকে নাকি আজও ?

—তাহলে আমার মনে পড়ছে কেন ?

—তোমার স্মৃতিশক্তি আমার চেয়ে বেশি বলে।

—তুমি শুধু একটু মোটা হয়েছ। আর কিছুই বদলায় নি তোমার।

—ওসব কথা কেন তুলছো ভাস্কর? কি লাভ? শেষ করো।

—তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে, এটা নিয়তি মিলি। নইলে তো আমার হঠাৎ বিলেত চলে যাওয়ার পরই সব শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। আমি ভারতবর্ষে ফিরে এলাম কেন? আর এলাম এমন এক অফিসে যেখানে অশোক আমার কলিগ। তুমিই যে অশোকের স্ত্রী হয়ে গেছ এটা জানার পর—

—ভাস্কর, দেখ, সত্যিই আর ভালো লাগছে না আমার। চলো না; উঠি।

বসুধা, বুকের আলগা শাড়িকে কাঁধের দিকে এমনভাবে টানে, যেন ওঠার জন্যে সে এখুনি প্রস্তুত। নিচু হয়ে ঘাড়ের ছাঁটা চুল গালে এনে সে টেবিলের তলায় স্যাণ্ডেল খোঁজে। ভাস্কর টেবিলের উপরে উপুড় ঘাড়-তোলা কচ্ছপ। তার চোখ বসুধার বুকের সেই অনাবৃত অংশে যেখানে ডালিমের বাগান। এই বাগানে একদিন অবাধ অধিকার ছিল আমার। একদিনের অধিকার পরের দিনগুলোয় কি করে হয়ে যায় অবৈধ? এই রকম একটা জটিল ধাঁধার উত্তর খুঁজে না পেয়েই যেন গেলাসের মদটা হঠাৎ তার জিভে তেতো। মদে চুমুক দেওয়ার পর তার মুখের বিকৃত ভাঙচুর দেখে অন্তত সেই রকমই মনে হওয়ার কথা। তবে তেতো লাগলেও ভাস্কর এক ঢোকে গিলছে অনেকখানি। বসুধা যে বসবে না, বসলেও বসুধাকে যে ষোলো বছর আগেকার মিলিতে ফিরিয়ে আনা যাবে না, এটা আন্দাজ করে নিয়েছে সে। সুতরাং উঠতেই হবে।

পায়ের নানা সময়ের ধাক্কা লেগে দূরে দূরে সরে যাওয়া জু-পাটি স্যাণ্ডেলকে পায়ের আঁকশিতে এক জায়গায় জড়ো করে, ঘাড় তোলে বসুধা। ঘাড়ের মৃদু ঝাঁকুনিতেই গালের পাশে মাধবীলতার ডালের মত ঝুঁকে আসা চুলের থোকা আবার ঘাড়ে। টেবিলের উপরে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগের পাশে রাখা সানগ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া

করে, চোখে পরে নিয়ে নিজের গেলাসের দিকে তাকায়। পরে ভাস্করের নিজের গ্লাসটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে

— শেষ করো-ও-ও।

অনেকটা হুকুমের মত। কিন্তু উপরওয়ালার হুকুম নয়। আত্মার সঙ্গে আস্টেপৃষ্ঠে জড়ানো আত্মীয়ের হুকুম। বিনতা, তার স্ত্রী এইভাবেই বলে, এবার খাবে এসো-ও-ও। ষোলো বছর আগে মিলিও এইভাবে ঘাসের উপর পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ানোর মুহূর্তে, ছোঁ মারা চিলের তৎপরতায় প্যাকেটাকে নিজের মুঠোয় আঁকড়ে বলতো. আর নয়—য়-য়।

সানগ্লাস পরে বসুধা গাড়িতে ওঠে নি। অশোক বসেছিল ভাস্করের পাশে। বসুধা পিছনে। গাড়িতে উঠেই চোখে লাগিয়েছিল ওটা। আবার খুলে নিয়েছিল এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ঢুকে। বুনো মথের ছড়ানো ডানার মত গগলস-আঁটা বসুধাকে দেখে তখন মানে খুঁজে পাওয়ার মত কিছু মনে হয়নি ভাস্করের। কিন্তু এখন হল। বসুধার চোখের গগলস্‌টাকে, গগলস্‌-এর চেয়েও বড় মনে হল অনেকখানি। যেন মুখোশ। ছদ্মবেশের অবলম্বন। যেন বোঝাতে চাইছে, আমি মিলিও নই, বসুধাও নই। আমি অন্য একজন। অপরিচিতা। সুতরাং সেই রকম ব্যবহার করো। অনধিকার চর্চার পারমিট পেয়ে গেছ ভেবে নিয়ে হুদ্দাড় ঢুকে পড়বে না আমার বাগানের ঘেরা এলাকায় পাঁচিল টপকে।

— বেশ লাগছে তোমাকে।

বসুধার চোখ থেকে গগ্‌লসটাকে একটানে উপড়ে-আনার হিংস্র ইচ্ছেটাকে সামলে নিজেকে সেই ষোলো বছর আগেকার প্রণয়ী সাজিয়ে, মুখে শিল্প-বিশেষজ্ঞের জহুরী হাসি এনে, নিজের কচ্ছপ মার্কা স্থবির ভঙ্গীটাকে ভেঙে, আরও গাঢ় স্তাবকতার স্বরে আগের উচ্চারণটাকে মোলায়েম করে নেয় ভাস্কর।

—সত্যি বলছি।

ভীষণ হাসতে ইচ্ছে করছে ভাস্করের। য়ুনিভার্সিটি পিরিয়ডে তার

সেই বিখ্যাত হাসি। সেনেট হলের পায়রা উড়তো সে হাসিতে। ডিবেটে ফার্স্ট ভাস্কর চৌধুরীর সেই জিভে বিদ্যুতের ঝলসানি তুলতে চাইছে এখন প্রখর বিদ্রূপ, অর্থাৎ শানিত বচন। ষোলো বছর আগে যে-ডিবেটপ্রতিভায় সে মিলির মত ঘুমের রাতের পরীকে টেনে আনতে পেরেছিল নিজের আলিঙ্গন-চুম্বন এমনকি অবৈধ রাত্রিবাসের দুটো-চারটে দুর্লভ সীমানায়, মোমের মত গলিয়ে দিতে পেরেছিল যে মিলির শক্ত ঘাড় অথবা মানুষের জন্যে নয় এমন অধরা সোনার হরিণ সেজে বেড়ানোর প্রখর ব্যক্তিত্ব, এখন, যদিও অব্যবহারের মরচে লেগে ভোঁতা, সেই অস্ত্রটাকে দিয়েই বসুধাকে আক্রমণ করলে কেমন হয়?

ভাস্কর নিজের ভারী শরীরটাকে ঠেলে চেয়ারের দিকে নিয়ে যায়। ঘাড় পর্যন্ত উঠে এসেছে নেশা। তাই ঘাড়টা একটু নড়বড়ে। নিজের ঘাড়টা সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ সচেতন হয় সে। এই নড়বড়ে ঘাড় দেখলে ভয় পেয়ে যাবে মিলি। মিলি অথবা বসুধা। এই রকম নড়বড়ে ঘাড় নিয়ে কি করে মানুষটা তাকে পৌঁছে দেবে দশ মাইল নাকি তেরো কিলো-মিটার দূরের বাড়িতে? ভেবে মিলি আরও বেশি ঢুকে যেতে পারে শামুখের খোলে। তাই ঘাড়টাকে প্রাণপণ অথচ বহিঃপ্রকাশহীন এক ধরনের অন্তর্গত চেষ্টায় চমৎকার স্বাভাবিক করে রাখার চেষ্টা করে সে। তবুও ঘাড়টা ডাইনে একটু ঝুঁকে পড়তে চায়। অতএব একটু ডাইনে ঝুঁকেই মিলি বা বসুধাকে আরও নিবিড় অবলোকনের বিশেষ আগ্রহ যেন, এইভাবেই সে নিজেকে স্বাভাবিকতায় স্থাপিত করে। এরপরে, অর্থাৎ ঐ 'সত্যি বলছি'—র পরে, কি বলবে তার সংলাপ গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে ঠোঁটের আড়ালে।

—কবে থেকে দুটো বাদুড় পুষেছ তোমার চোখে?

এই প্রশ্নটাকে চোখের কটাক্ষ আর জিভের উচ্চারণের বিদ্রূপাত্মক মোচড়ে বসুধার দিকে অগ্নিবাণের মত ছুঁড়ে দিতে চেয়েও সে নিজের অবচেতনাকে জিতিয়ে দিতে না পারার অক্ষমতায়, বলে ওঠে

—তোমাকে মনে হচ্ছে কবেকার সভ্যতার অস্থিমজ্জা-হাড়ের

ভিতরে আবহমান লালিত সেই নারী, যার নাম ইউরিদিকে। বিশ্বাস করো, তোমাকে আর মিলি মনে হচ্ছে না এতটুকু। তুমি যে বসুধা, বসুধা বাগচী, অশোক বাগচীর স্ত্রী, অশোক, যে কিনা সাপ্রু অ্যাণ্ড সাপ্রু কোম্পানির কলকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার, তাও মনে হচ্ছে না। তুমি যেন আর কেউ। তৃতীয় একজন, যাকে আমি চিনি না, অশোকও চেনে না।

পেগের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। সুতরাং ভাস্করের উচ্চারণ জড়িয়ে গিয়ে থিয়েটারের ছাপ-মারা চিরকেলে মাতালের মত ঘণ্টপাকানো হওয়ার কথা নয়। এবং হয়নিও। আট পেগ স্কচের আগে ভাস্করের রক্তে নেশা ঢোকে না। তাই প্রত্যেকটা কথাই বসুধা স্পষ্ট শুনতে পায়। আর শুনতে শুনতে, ভাস্করের একেবারে শেষ কথাটায় পৌঁছে, চমকে ওঠে। যেন হঠাৎ সাপের ল্যাজে তার পা।

এ কি? কি বলল ভাস্কর? অশোকও চেনে না? তার মানে ভাস্কর কি জানে, জেনে গেছে, অশোকের বাইরে, অশোককে বাদ দিয়ে আমার জীবনযাপনের সমস্ত গোপন খবর? জেনে গেছে বলেই, আজ আমার সঙ্গে এই তামাসা-তামাসা খেলা? অশোকই ওকে বলেনি তো, তোমরা দুজনে একটু মদ্যপান কোরো, যতটা পারো বেশি খাইয়ো বসুধাকে। খাইয়ে খাইয়ে ওর লোহার পাইপের মত শক্ত শিরা-উপশিরাগুলোকে প্লাসটিকের মত নরম করে এনে জানবার চেষ্টা কোরো তো, আমি ছাড়া আর কোনো কামারশালার হাপরের আগুনে নিজেকে সেঁকে নিতে চাইছে কিনা ও?

—ইউরিদিকে। মনে আছে নিশ্চয় সেই পুরাণপ্রতিমাকে?

ভাস্কর বলে যায়। বসুধা শুনবার চেষ্টা করে না।

—অর্ফিয়ুস এর প্রিয়তমা। আবার অর্ফিয়ুসের মৃত্যু।

হ্যাঁ, অর্ফিয়ুস কে তা ভালো করেই জানে বসুধা। কিন্তু মনে পড়ে না এখন সে-সব। ঠিক এই মুহূর্তে অশোকের নামোচ্চারণ করে ভাস্কর যা বলল, তার আকস্মিকতায় অর্ফিয়ুস, ইউরিদিকে, গ্রীক-পুরাণ সমস্তটাই হাত থেকে পড়ে-যাওয়া দইয়ের ভাঁড়ের মত ছত্রখান।

—তুমি কি বিশ্বাস কর মিলি, সেই কবেকার মিথ্ এখনো এই একবিংশ শতাব্দীর দোরগড়ায় দাঁড়ানো কমপিউটার-এজেও সত্যি? ভালোবাসার নারীর দিকে ফিরে তাকানো মানে অপমৃত্যু?

বসুধার কানে ঢুকছে না কিছু। স্টার্ট নেবার আগের মুহূর্তের এঞ্জিনের মত কাঁপছে তার মনের ভিতরের মন।

অশোক কখনো মিলিকে দেখেনি। এলাহাবাদে আবাল্য মানুষ। বিলেত থেকে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে, সে যাকে বিয়ে করে সে মিলি নয় বসুধা। বিয়ের পর তিন-চার বছর চমৎকার। ঠিক তার কামনা-বাসনার ছন্দ মেলানো দাম্পত্য। তারপরই ক্রমে ক্রমে অশোকের পদোন্নতি। অশোকের পদোন্নতি মানে তাদের জীবনযাপনে আরও সম্পদ-সমৃদ্ধির ঠেলাঠেলি। আর মানুষ অশোক কিংবা স্বামী অশোকের রোবোটে রূপান্তর। এখন সারাদিনে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কি কথা বলবে, তার সবটাই বসুধার মুখস্থ। আবার সেটুকু বলারও অবকাশ আজ অশোকের জীবনে বড় সীমিত। মাসের মধ্যে সতেরো দিন দৌড়তে হচ্ছে কলকাতার বাইরে কোম্পানির কাজে। যত দৌড়চ্ছে, ততই পার হয়ে যাচ্ছে সুখ সফলতার সিঁড়ির ধাপগুলো। আর ততই গড়ে উঠছে বসুধার সঙ্গে তার ব্যবধান।

—চল না কাল একটু হেনরী মুরের একজিবিশন দেখে আসি বিড়লা আকাদেমিতে।

দু-বছর আগের একটা দিনের স্মৃতি এখুনি দপ্ করে জ্বলে উঠল স্মৃতিতে। লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই-এর নট বাঁধতে বাঁধতে অশোক বলেছিল

—কখন?

—বিকেলে?

—ইমপসিবল। কাল বিকেলে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আমার একসক্লুসিভ মিটিং।

হেনরী মুরে যাওয়া হয়নি। কিন্তু এত ভালবাসে তাকে অশোক যে

পরের দিন রাত্রে গাড়ি থেকে নামল যখন একহাতে নিজের অ্যাটাচি, আর অন্য হাতে বগলদাবা-করা মোটা মোটা খানতিনেক বই। বিষয় হেনরী মুর।

ঘরে বসে হেনরী মুরের ছাপা ছবি দেখা আর স্বামীর সান্নিধ্যে তার আসল সৃষ্টিকাজের সংলগ্ন হওয়ার মধ্যে কতখানি যে ফাঁক, সেটা বোঝার মত বিবেচনাবোধ অশোকের মনের ভিতরে এখন ফ্লাওয়ার-ভাসে শুকিয়ে-থাকা কবেকার বাসী ফুল। মিলি মরে গেছে বিয়ের পর। এখন বসুধাও মরতে বসেছে। আমি মিলি ছিলাম শুধু ভাস্করের, ছাত্র-জীবনে। বসুধা শুধুমাত্র অশোকের দখলে, বিয়ের পর! এদের দুজনেরই মৃত্যুলগ্নে, হঠাৎ, এদের দুজনকে বাদ দিয়ে নতুন এক চরিত্রের জন্ম, দিতি, আফ্রোদিতির ভগ্নাংশ।

—হঠাৎ তোমার মাথায় এ নামটা এল কেন?

তোমাকে ডাকবো দিতি বৌদি, তিন বছর আগে আকাদেমি থেকে নাটক দেখে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফেরার সময় আচমকা বলেছিল সুমন্ত।

—কেন এল জানি না। হঠাৎই মনে হল তোমার একটা নতুন নাম দি। আফ্রোদিতি নামটা খুব ভালো লাগে। কিন্তু আফ্রো কথাটা আজকাল রাজনীতির সঙ্গে মিশি গিয়ে কেমন খটোমটো হয়ে গেছে।

গত বছর থেকে আর বৌদি বলে না সুমন্ত। বলে না বসুধারই দাবড়িতে।

—কানের সামনে এক বৌদি বৌদি শুনতে ভাল্লাগে না আমার। নিজেকে বুড়োটে বুড়োটে লাগে। শুধু দিতি বলতে পার না?

—সকলের সামনে?

—সকলের সামনে মাসীও বলতে পার, ঠাকুমাও বলতে পার। এখন তো কেউ সামনে নেই। এখন বলতে কি অসুবিধে?

সেই থেকে দিতি। সুমন্তর মুখের দিতি ডাকে, জীবনের উৎসে ফিরে যাওয়ার উৎসাহ পায় আজকাল বসুধা। ঐ এক ডাকে তার হারিয়ে যাওয়া ছাত্রজীবনটা, ছাত্রজীবনের যা কিছু আবেগ-উত্তাপ-চঞ্চলতাকে

আবার ছুঁতে পারে সে। সুমন্ত রাজনীতি করে। বাম। সুমন্ত নাট্য আন্দোলনের এক প্রধান নেতা। সুমন্ত নাটক লেখে। অভিনয় করে। পাগলের মত গান গাইতে পারে। ছবি আঁকে। পোস্টার লেখে। যখন-তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পোস্টারড্রামা করতেও উৎসাহে ডগোমগো।

মরা অথবা আধমরা আমাকে বাঁচিয়ে দিল সুমন্ত। পরশু রেকর্ডিং করল আমার গান। ছাত্রজীবনের সেইসব উত্তাল আন্দোলনের সময় খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে একদিন গেয়েছিলাম যে-সব গান, বিয়ের পর শুকিয়ে কাঠ তারা কণ্ঠনালীর ভিতরে। সুমন্ত সত্যিই যাতুকর। কি করে যে পারল আমাকে দিয়ে গাওয়াতে? ওর নতুন নাটকে ব্যবহার করবে। আমি আমার ভিডিও-ভিসিআর, টিভি, টেলিফোনে ঘেরা ঘরের যান্ত্রিক ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আবার বাইরের পৃথিবীর খোলা হাওয়ার দিকে।

সুমন্ত তার নতুন নাটক পড়ে শোনাচ্ছে। তেমন সময় ফিরে এসেছে অশোক। কেমন আছেন?—ভালো? বা ঐ জাতীয় নিছক ভদ্রতা রক্ষার প্রশ্নটুকু করেই নিজের ঘরে চলে গেছে অশোক। সুমন্ত সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল নেই। সন্দেহ নেই। আশংকা নেই। সুমন্তর গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। সুমন্তর পরনে পাজামা আর এক রঙা পাঞ্জাবীই বেশির ভাগ দিন। সুমন্তর মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। সুমন্তর কাঁধে সবসময়েই একটা ঝোলা-ব্যাগ।

প্রথম দিনই অশোক দেখে নিয়েছে ওর সর্বাঙ্গের মধ্যবিত্ত ছাপ। সন্দেহ সজারুর কাঁটা। কিন্তু অশোকের মনে তা গজায় নি। যার স্ত্রী মার্কেটিং করতে যায় মারুতি চেপে, সে যে কখনো ঐ রকম ছেলের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলাতেও মাততে পারবে না আর, এই রকম বিশ্বাসে অশোক অশোকস্তম্ভের মত মজবুত। ওদের সম্পর্ক নিছক স্নেহ-শ্রদ্ধারই।

তন্দ্রা ভাঙিয়ে দিয়ে ভাস্করের গলা

—তুমি কিছু বলছ না কেন মিলি?

—কি বলবো?

—আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না?

—কোন্ প্রশ্ন ?

—ঐ তো বললাম। একবিংশ শতাব্দীর দোরগড়ায় যখন আমরা, তখনও কি বিশ্বাস করতে হবে ইউরিদিকের দিকে ফিরে তাকালেই অর্ফিয়ুসের মৃত্যু ?

—কে তোমার ইউরিদিকে ?

—যদি বলি তুমি ?

—তাই নাকি ? একটু আগেই তো তুমি বললে, আমি যেন অন্য একজন, যাকে তুমি চেন না।

—সে তো তোমাকে দেখে বলি নি। আমার সম্পর্কে তোমার নিস্পৃহ ভঙ্গী দেখে বলেছিলাম।

—তাই ? বাঁচালে।

—কেন, বাঁচালাম কেন ?

—আমি তো এতক্ষণ ভয়েই মরছিলাম, আমি যে তোমাদের কেউ নই, সেটা বুঝি জেনে গেছ তুমি।

—তার মানে ?

—যেটুকু আছে, শেষ করো। উঠবো।

—বৃষ্টি তো থেমে এসেছে।

—জানি। সেজন্যই তো উঠতে হবে আরও তাড়াতাড়ি।

—কেন ?

—সুমন্ত আসবে ক্যাসেট শোনাতে।

—সুমন্ত ? সে কে ? কিসের ক্যাসেট ?

—সুমন্তকে তুমি চিনবে না। তবে ক্যাসেটটা আমার গানের।

—তুমি গান গাইছো ?

—গাইছি না। গাইতে যাচ্ছি।

—কি বলছ বসুধা ? সত্যি ? কোন গান ?

—তোমার এক সময়ের সবচেয়ে প্রিয় গান ! কোনটা বলতো ? য়ুনি-ভার্সিটি ইনস্টিটিউটে গেয়েছিলাম। সিক্সটি সেভেনে। ছাত্র ফেডারেশন

জিতল।

ভাস্কর গেলাসে শেষ চুমুক দিতে গিয়ে থেমে, গেলাসটা নামিয়ে রেখে, সিগারেট ধরিয়ে, মাথা নামিয়ে মাথার চুলের ভিতর পাঁচ আঙুলের চিরুনি চালিয়ে ভাবতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ গভীর জলে নাকানি-চুবোনি খেয়ে ডাঙায় ওঠার ভঙ্গীতে

—এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।

—না, ও গান তোমাকে শুনিয়েছি। ওটা জনসভায় গাইবার গান নয়।

—তাহলে ?

—ভাবো। ভেবে বলো।

—তাহলে কি, বাঁধ ভেঙে দাও ?

—ওটা কোরাসে গাইতাম।

—খর বায়ু বয় বেগে ?

—মিলিকে তোমার মনে নেই ভাস্কর···

—আছে। আছে। তুমি বল কোন্ গান ?

—তুমিই বল না কোন্ গান। আরও মনে করিয়ে দিচ্ছি। গান গাইবার আগে কবিতা পড়েছিল শিবতোষ। শিবতোষ লাহিড়ী।

—গানটা মনে পড়ছে না কেন ?

—আমি পরেছিলাম আগুন রঙের শাড়ি।

—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় ?

—খোঁপা বেঁধেছিলাম ঘাড়ের উপরে।

—যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ?

—একটুও সাজগোজ করিনি। তবু তুমি এবং তোমরা বলেছিলে

—মম চিত্তে নিতি নৃত্যে···

—তুমি পারবে না ভাস্কর। তোমার কাছে সমস্ত অতীতটা মুছে গেছে। আমার শরীরটা দেখেই তোমার শুধু মনে পড়ছে মিলির কথা। অথচ মিলিকে দেখেও মনে পড়ছে না সেই সময়টাকে যখন আমরাই

ছিলাম তার আগুন জ্বালাবার খড়কুটো, কাঠ-কাঠরা। সমস্ত আন্দোলনের স্মৃতি তোমার মন থেকে মুছে গেছে ভাস্কর। আর অশোক, সে এলাহাবাদে মানুষ। কলকাতার আন্দোলন যে কি জিনিস সে জানে না।

—মিলি-ই-ই। মনে পড়েছে। আলো আমার আলো ওগো আলোয়

—আর মনে করার চেষ্টা কোরো না ভাস্কর। মনে পড়বে না। চলো উঠি। সুমন্ত বেচারী অপেক্ষা করে ফিরে যাবে ভিজে ভিজে এসে।

বসুধা চোখ থেকে কালো গগ্‌লসটা খুলে নিজের ব্যাগে রাখে। চশমাহীন বসুধার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাস্কর আর মিলিকে খুঁজে পায় না। বসুধা নয়। মিলি নয়, এ যেন সত্যিই অন্য কেউ!

ভাস্কর উঠে দাঁড়ায়। ল্যাট্রিনে যাবে।

বাচ্চা হাতীর মত ভাস্করের শরীরটা থপথপে থাবা ফেলে দূরে যাচ্ছে যখন, বসুধার মনের মধ্যে তখন গভীর রাতের অন্ধকার প্রান্তরে ট্রেনের তীব্র হুইসেলের মত ডাক

—সুমন্ত চলে যেও না, যাচ্ছি-ই-ই। এখুনি-ই-ই।

ওয়াটারকালারের বস্তী

সুভাষ সরোবর আর ইস্টার্ন বাইপাসের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিকাশ। সল্টলেক থেকে স্টেডিয়ামের পিছন দিয়ে হেঁটেই এসেছে ও। বেলেঘাটার দিকে বাস থেকে নামল কান্তা। নেমেই দৌড়ে বিকাশের কাছে।

—অনেকক্ষণ এসেছ ?

—না। মিনিট সাতেক আগে। একটা সিগারেট খেতে খেতেই তো এসে গেলে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ব্লাণ্ডার করেছি।

—কেন ?

—এদিকে বস্তী কোথায় ? আমরা যে-রকম চাই সে রকম বস্তী ?

—তুমিই তো বললে, দেখেছ।

—বাসে যেতে যেতে দেখেছিলাম তো। ঠিক এদিকটায় দেখেছি না বেলেঘাটা ছাড়িয়ে ওদিকে, সে তো আর মনে নেই।

—তাহলে কি করবে ?

—ঘাবড়াচ্ছ কেন ? এগোই তো। ঠিক পেয়ে যাব। বস্তী না পাই, আঁকবার মতো কিছু তো পাব।

ওরা বেলেঘাটার দিকে মুখ করে হাঁটতে থাকে। দুজনেরই কাঁধে

ঝোলানো ব্যাগ। বিকাশ রোগা, লম্বা। ভিজে শালিকের পালকের মতো মাথা ভর্তি ঘাঁটা চুল। চিবুকে পাতলা দাড়ি। গলার কণ্ঠি বেরনো। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। কান্তা সামান্য বেঁটে-খাটো। কাঁধের ব্যাগটা তাই তার হাঁটু ছাড়িয়ে। চলতে অসুবিধে, তাই বাঁ হাতে ব্যাগটাকে একটু টান-টান ধরা। লম্বা-চওড়া ব্যাগ। তা না হলে চলেও না। ষোলো বাই চব্বিশ ইঞ্চি কাঠের বোর্ডটাকে ধরাতে হবে হবে তো। বোর্ডে ওয়াটার কালার পেপার সেঁটে লাগানো। তা ছাড়া ব্যাগের ভিতর রাশিকৃত জিনিস। রঙ, তুলি, জলের জায়গা, ভাঁজ-করা খবরের কাগজ, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ফোল্ডিং টুল। বিকাশের ব্যাগেও একই জিনিস। অতিরিক্ত বলতে, একটা ইংরেজি বই, হাউ টু ড্র ল্যাণ্ডস্কেপস্।

শীতের দুপুর, ফাঁকা রাস্তা। তাই, হাওয়া বেশ। হাওয়া ঠেলেই হাঁটে ওরা। এই রোদে, গায়ে ঠিকঠাক শীত-ভাগানো পোশাক থাকলে, ভালই লাগে হাঁটতে। একটা ব্রীজ পেরনোর পর রাস্তার দু'পাশ থেকে দোকান-পাট-মানুষজন মুছে যেতেই বিকাশ বলে

—এ্যাই, এদিকে এস।

কান্তা পাশে এলে ওর হাতটা ধরে। কান্তা ধরতে দিয়েও একবার পিছন ফিরে দেখে নেয়। না মানুষ নেই কোনখানে। শুধু লরী, বাস, ট্যাক্সি আর হরেক রকম প্রাইভেট গাড়ির প্রাণপণ দৌড়। রাস্তার দু'পাশে শাক-সব্জির বিশাল খেত।

—ঠিক মনে হয় যেন সত্যি, দেখ।

কান্তা বিকাশের মুঠোয় ধরা হাতটাকে ঝাঁকুনি দেয়।

—কোনটা?

—এরোপ্লেনটা। মনে হচ্ছে না সত্যি সত্যি উড়ে আসছে আমাদের দিকে?

—ওঃ, ওটা তো বিজ্ঞাপন। হোর্ডিং।

—সে তো জানি। অত শূন্যে উঠে অতবড় এরোপ্লেন সত্যিকারের মতো করে আঁকা বেশ কঠিন। কি করে আঁকল?

—ও এমন কিছু নয়। গ্রাফ করে আঁকা। অঙ্কের ব্যাপার।

—তুমি পারবে ঐ রকম শূন্যে উঠে আঁকতে ? হাত পা কাঁপবে না ?

—অভ্যেস হয়ে গেলে কাঁপবে না। কিন্তু আমি ওসব আঁকতে যাব কোন দুঃখে ? আমি তো নেব ফাইন আর্টস।

—আর আমি যে কমার্শিয়াল নিচ্ছি ?

—তাহলে তুমি আঁকবে ওসব।

—আহা ! কমার্শিয়াল নিলেই বুঝি ওসব আঁকতে হয় ?

—জানো যদি, তাহলে আবার ভাবনা কি।

—কি জানি, ভয় করে বেশ। যদি না পারি।

—কী না পারি ?

—ঠিকমতো শিখতে···

—খুব পারবে। উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে···উই শ্যাল ওভারকাম।

বিকাশ, কান্তাকে চমকে দিয়ে, গলা ছেড়ে গানটা গেয়ে ওঠে হঠাৎ। উই শ্যাল ওভারকাম। মুঠোয় ধরা কান্তার হাতটাকে দোলাতে থাকে গানের তালে। ছুটন্ত গাড়ির সওয়ারিরাও শুনতে পায় বিকাশের তেজালো স্বর। কেউ কেউ ঘাড় ঘোরায় পলকের জন্যে। কান্তার সারা শরীরে বিদ্যুৎ। বিকাশ যে গাইতে পারে এমন সুন্দর, জানত না কখনো। এখন সে যেন পৃথিবীর অন্য কোনো পারে। সব্জি-খেতের সবুজ রং তাকে যেন নাচতে বলছে তখন। আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে তিন বছর নাচ শিখেছে সে, যখন কলেজে পড়ত। কাঁধের ব্যাগটা বিকাশকে ধরিয়ে দিয়ে ইচ্ছে করলে সত্যিই সে নাচতে পারে এখুনি। বিকাশের গানের সঙ্গে নাচতে নাচতে এই সব্জি-খেতের ভিতর দিয়ে অনন্ত দূরে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল কান্তার।

হঠাৎ গান থামিয়ে বিকাশ

—ঐ তো।

বিকাশের তাকানোর দিকে কান্তার চোখ।

—কি ?

—দেখতে পাচ্ছ না ? চালাঘর।

আধমাইলটাক দূরের দৃশ্যটা কাস্তা দেখতে পেয়ে

—ঐ তোমার বস্তী ?

—বস্তীর মতোই তো। আমরা তো আর ঘন একটা সত্যিকারের বস্তী চাই নি। বস্তী বলতে আসলে চাইছিলাম তো চালাঘরই। ধর্মতলায় হাঁটতে হাঁটতে—

বিকাশের মুঠো থেকে খসে গিয়ে কাস্তার ডানহাতটা স্বাধীন। সালোয়ার কামিজের উপরে উড়ুনি। সেটা একদিকে ঝুলে। কাস্তা গুছিয়ে নেয়।

—শুনছ না তো।

—হুঁ। তুমি বল না।

—ধর্মতলায় হাঁটতে হাঁটতে দশ পনেরো বছর কি তারও আগের হবে, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর অ্যানুয়াল এক্সিবিশনের একটা কাটালগ পেয়ে যাই। তার মধ্যে পানিক্কর-এর আঁকা ওয়াটার-কালারের বস্তী ছিল। ঠিক সেই রকম একটা বস্তী খুঁজছিলাম আমি। বস্তীটায় একটা গাছ। কি অসাধারণ হ্যাণ্ডলিং অব কালার। বল্কলের ফাটলগুলো পর্যন্ত ডিসটিংক্ট।

—যেখানে যাচ্ছি, ওখানে ওরকম গাছ পাবে ?

—পাই না পাই, বেরিয়ে পড়েছি যখন, কিছু একটা তো করতে হবে।

বেশ খানিকটা হাঁটার পর বাঁ দিকে দু'পাশের সব্‌জি-খেতের ভিতর দিয়েই ওরা পেয়ে যায় হেঁটে যাওয়ার সরু পথ।

খানিকটা এগিয়ে কাস্তার গলায় পাখির ডাক।

—এই, দেখ দেখ, কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলকপি···ওরে ব্যাবা, কত-ও-ও।

—আর এদিকে বেগুন দেখেছ ?

বিকাশের কোমর জড়িয়ে ধরে কান্তা।

—মাটির গন্ধটা কি রকম অদ্ভুত। মিষ্টি মিষ্টি।

—খাবে নাকি? খেলে তুমিও ফুলকপির মতো ফুলে উঠবে।

—ইয়ার্কি মের না।

২

—ইদিকে কোতা যাচ্ছেন?

প্রশ্ন করার মানুষটাকে প্রথমে দেখতে পায় নি ওরা। দেখতে পায় লম্বা আখ খেতের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে। কান্তা নিমেষে হাত সরিয়ে নেয় বিকাশের কোমর থেকে।

—আমরা? ঐ বস্তীটার দিকে।

—কুন পার্টির লোক আপনারা?

—পার্টি-ফার্টির লোক নই। আর্টিস্ট।

· সিটে আবার কুন পার্টি?

—আমরা ছবি আঁকি। ছবি।

—অ। ফটোক তুলেন?

লোকটা খেত থেকে বেরিয়ে রাস্তায়। হাতে লম্বা কাস্তে, খালি গা। খাটো কাপড় কোমরে জড়ানো। মাথায় স্প্রিং-এর মতো গোল-গোল চুল। মুখে কাঁচা-পাকা অল্প কদিনের না-কামানো গোঁফ-দাড়ি। গলায় তুলসীর মালা। হাতে লাল তাগায় ঢোলক সাইজের মাদুলি।

—ত ইখেনেই তুলুন না কী ফটোক তুলবেন।

—আমরা ঐ চালাঘরটা আঁকব।

—উ চালাঘর কি ফটোক তুলার মতো চালাঘর নাকি? বন্যায় ভাসতে ভাসতে ইখেনে এসে উঠেছি কবছর। মাটির দেবাল গাঁথার পয়সা নেই। ঐ ছিটেবেড়া তুলে রয়েছি কঘর মনিষ্যি।

—ও, ঐখেনেই আপনার বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—তো চলুন না আমাদের সঙ্গে। আপনি গেলে ভাল হয়।

লোকটা অর্থাৎ নিত্যানন্দ কি যেন ভাবে। তুজনেরই তু-কাঁধে অতবড় ঝোলা কেন? দেওয়ালে পোস্টার মারতে এসেছে? নাকি লিখবে কিছু আলকাতরা দিয়ে? দেওয়াল কই যে লিখবে? বিকাশ আর কান্তাকে খুঁটিয়ে দেখে। কোনো মতলবের মানুষ কিনা তার হিসেব কষে।

—অ তিলে-এ, তিলে-এ-এ।

আখের খেতের ভিতর থেকে তিলের সাড়া এলে—

—অ্যাই, ইখেনে কাস্তিটা রেখে গেন্থু। নিয়ে যা। আমি বাড়ি পানে যাচ্ছি। চলুন।

নিত্যানন্দ আগে। পিছনে ওরা।

বাড়িগুলোর প্রায় কাছাকাছি এসে বিকাশ থমকে দাঁড়ায়। কান্তা বিকাশের দিকে মুখ তুলে।

—এখান থেকে আঁকবে?

—না, এমনি দেখছি।

আরো খানিকটা এগিয়ে আবার দাঁড়ায় বিকাশ। এক চোখ বুজিয়ে দূরের দৃশ্যটাকে দেখে।

—একটু উত্তর দিকে গেলে, আলাদা আলাদা তিনটে বাড়িকে এক সঙ্গে পাওয়া যাবে। দেখেছ?

কান্তাও বিকাশের ভঙ্গিতে দেখে। বিকাশ উত্তর দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা খোঁজে। নিত্যানন্দ বলে

—উদিকে তো আর রাস্তা নেই। উদিকে যাবেন কেন? ইখেনেই বসুন না। আমি চেটাই এনে দি।

—না-না, চাটাই লাগবে না। আমাদের সঙ্গে বসবার জায়গা আছে।

ক্যানভাসের ফোল্ডিং টুল বেরোয় তুজনের ব্যাগ থেকে। মাঝখানে হাত পঁচিশেক ব্যবধান রেখে ওরা বসে। ছবির সাজসরঞ্জাম গোছগাছ করে নেয়। নিত্যানন্দ কান্তার থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। জলের মগটা হাতে নিয়ে কান্তা উঠে দাঁড়ায়।

—জল পাবো কোথায় ?

—জল ? আমাকে দিন। উদিক থিকেন এনে দিচ্ছি। পুকুর তো উদিকে।

কথাটা কানে যায় বিকাশের।

—পুকুর আছে নাকি ?

—আছে ত। উদিকে আছে। ইদিকটা তো বাড়ির পিছন দিক।

—তাই নাকি ? পুকুরের দিকে যেতে পারি না ?

—যাবেন ? তো আসুন।

খুলে ছড়ানো জিনিসপত্র আবার ছুটপাট গুছিয়ে ওরা পুকুর পাড়ের দিকে। বিকাশ খুব জল আঁকতে ভালবাসে। জলে প্রতিবিম্ব ফোটাতে পারে চমৎকার। পুকুর আছে শুনে বিকাশের মুখে আলো খেলা করে।

৩

নিত্যানন্দ-র মুখ থেকেই পাশাপাশি চারটে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে খবর। কলকাতা থেকে তাদের এই চালাঘর আঁকতে এসেছে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সাড়া পড়ে গেছে তাই। বউ-ঝি-রা বেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ওদের দুজনের পিছনে ভাগাভাগি করে। কার যেন মাথার ছায়া পড়ছিল বিকাশের কাগজে। বিকাশ তাকে সরে যেতে বলে। কে একজন এগিয়ে এসেছিল কান্তার জলের মগের কাছাকাছি। কান্তা সরে যেতে বলে। তখনই পিছন থেকে ধমক লাগায় প্রৌঢ় নিত্যানন্দ। শুধু নিত্যানন্দ নয়, বয়স্ক আরো কয়েকজন কান্তা আর বিকাশের পিছনে।

কান্তা আলগোছে পেনসিলের খসড়া বানাতে বানাতে বিকাশের দিকে ঘুরে।

—তুমি গাছ পাচ্ছ ? আমার গাছটা আড়াল হয়ে গেছে।

বিকাশ দ্রুত টানে শেষ করে এনেছে তার খসড়া।

—দূরের কোনো গাছকে সামনে নিয়ে এস না। সেজানরাও তো

তাই করেছেন।

কান্তার সোজাসুজি পুকুর। পুকুর নয়, একটু বড়সড় ডোবা। তার উল্টোদিকের দরজার সামনে একটি ন্যাংটো মেয়ে আসা যাওয়া করছে। এবার সে একটু দাঁড়াতেই কান্তা ঝপ্‌ করে এঁকে ফেলে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হৈ চৈ।

—এই গো মোদের খুকী আঁকা হোয়ে গেল।

—অ বড়জেঠা, এই ছ্যাখো, তমাদের বুঁচি আঁকা হয়ে গেছে।

যারা বিকাশের পিছনে ভিড় করেছিল, তারাও ছুটে আসে কান্তার পিছনে। নানা গলায় নানা সুরের হাসির এক ঐকতান।

—অরে অ বুঁচি, তোর ফটোক উঠে গেছে। দেখে যা।

—অ মেজকা, ইদিকে এস না একবার। বুঁচির কেমন ন্যাংটো ছবি উঠেছে দেখে যাও।

বুঁচির ছবি দেখে হাসাহাসির পালা থামলে কেউ কেউ আবার বিকাশের পিছনে। চারটে বাড়ির পুকুর বা ডোবায় ঘাট একটাই। বিকাশ সেই ঘাটের পাশে বসিয়ে দিয়েছে একটা বেঁটেখাটো খেজুর গাছ। আসল খেজুর গাছটা আরও অনেকখানি ডাইনে। ছবির ফ্রেমের বাইরে। বিকাশ যখন খেজুর গাছ আঁকছিল, তখন ঘাটে নেমেছিল এক মাথা ঘোমটা দিয়ে চার বাড়ির কোনো এক বাড়ির বৌ। নিমেষে বিকাশ এঁকে নেয় তার স্কেচ। বিকাশের পিছনে তৎক্ষণাৎ হৈ হৈ।

—আগো, দেখ দেখ, ছোট্‌খুড়ি কেমন আঁকা হয়ে গেল ছবিতে। জল নিতে এস্‌ছিল। অমনি উঠে গেল ছবিতে।

—অ, ছোটকা, ছোট্‌খুড়িকে দেখবে তো এস।

যারা কান্তার পিছনে ছিল, তারাও দৌড়ে বিকাশের পিছনে।

—ঐ তো, কলসী ডুবোচ্ছে জলে। ছোট্‌খুড়ি একটু আগে জল নিতে এসেছিল নি?

আবার সমবেত হাসি।

—অ্যাই, চল আমরাও দাঁড়াই। অ্যাই বলাই, যাবি? ছবি উঠবে।

কমবয়সী একদল ছেলে দৌড়ে পুকুরের ওপারে। গা লাগিয়ে এক জোট। একটা ছাগল চরছিল অল্প দূরে। বিকাশ ছাগলটাকে বসিয়ে দেয় ডানদিকের বাড়ির দরজার কাছে।

—হায় দেখ গো···

বিকাশের পিছনে সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল।

—অ মনাদা, এই দেখ গো মোদের ছাগলও এসে গেল ছবিতে।

—ছাগল? ছাগলেরও ফটোক উঠে গেল?

হাসতে হাসতে কে যেন জোরে জোরে কাকে বলে

—আরে অ্যাই শিবে, তদের হাঁসগুলো কোতা? ছেড়ে দে না পুকুরে, তাদের ফটোক উঠে যাবে।

ঠিক সেই সময়েই খেত থেকে এক ঝুড়ি আগাছা নিয়ে ঘরে ফিরছিল একজন ছোকরা বয়সী ছেলে। পুকুরের ওপারে কিসের ভিড় সে জানে না। দেখে বুঝে নেবে বলে দাঁড়ানো মাত্রই পুকুরের এপার থেকে চিৎকার।

—সরে যা রে তিলে, সরে যা। দাঁড়ালেই ফটোক তুলে নিবে।

তিলে নামের ছেলেটি ঘাবড়ে গিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে কান্তা।

—চলে যেতে বলছেন কেন? দাঁড়াক না।

এপার থেকে আবার চিৎকার।

—অরে, দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া।

নিত্যানন্দ আবার ধমক দেয়।

—বড্ড চেল্লামিল্লি করতেছু তোরা। চুপ মার তো। এত হল্লা করলে ওনাদের কাজে বেঘ্ন হবে নি?

বিকাশ রঙ গুল্‌তে শুরু করেছে। কান্তা ঘাড় ঘুরিয়ে

—এই, একবার দেখে যাও না আমারটা।

সিগারেট ধরিয়ে বিকাশ উঠে আসে কান্তার কাছে।

—কেমন যেন স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক লাগছে। তাই না। কোনো মুভমেণ্ট নেই।

—না। ঠিকই তো আছে।

—ব্যালেন্স হয়েছে ?

—বাঁ দিকটা এত জায়গা ছাড়লে কেন ? ওখানে কিছু একটা বসিয়ে দিতে পার তো ?

—কি দিই ? চারদিক এত ফাঁকা।

—সেটা ঠিক। একটা গরুর গাড়ি-টাড়ির মতো কিছু থাকলে, দারুণ জমতো।

নিত্যানন্দ শুনতে পায় কথাটা।

—না বাবু, গরু-টরু পালতে পারি নি কেউ। যা আছে ঐ ছাগল আর হাঁস। গরু পালবার জায়গা কই ? এই তো এট্টুখানি ডেঙা। কুনু-মতে ছিটেবেড়া তুলে আছি। ইখেনেও যে কদ্দিন থাকতে পারবো—তার কি ঠিক আছে নাকি।

এসব কথায় কান দেওয়ার ইচ্ছে নেই বিকাশের। তবুও প্রশ্ন করে বসে—কেন ?

—কি জানি বাবু! উড়ো কথা শুনি কত রকমের। কেউ বলে ইখেনে হুটেল হবে। কেউ বলে শহর হবে আরেকটা সল্টো নেকের মতো। বড় বড় বাড়ি হবে। দালাল ঘুরতেছে নাকি।

বিকাশও শুনেছে ঐ রকম সব উড়ো কথা। আমেরিকা থেকে বাঙালী আর্কিটেক্ট ইস্টার্ন বাই পাসের ধারে কোনখানে যেন বিরাট কমপ্লেক্স করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই সব লাল-সবুজ-হলুদ খেত যে রোদের আলোয় ঝলমলাবে না এই হাই-রাইজের যুগে, সেটা কেউ না বলে দিলেও সে অনুমান করে নিতে পারে শহরের হালচাল থেকে।

বিকাশ আর নিত্যানন্দর কথায় মাথা না ঘামিয়ে কাস্তার ছবির দিকে তাকায়।

—একটা কাজ কর না। কলাগাছের ঝাড় বসিয়ে দাও না।

—ওরে বাবা, মন থেকে ? সে পারবো না।

—খুব পারবে। কদিন আগেই তো স্টাডি করেছ। তোমার দিকের

দেওয়ালের টেকস্‌চারটা মাচ বেটার। আর সময় নষ্ট কোরো না। রঙ লাগাও।

বিকাশ নিজের জায়গায় ফিরে আসে। সমস্ত রঙ গোলা হয় নি এখনো। আলটারমেরিনটা গুলতে গুলতে সে কান্তার দিকে

—আমার ইয়েলো অকারটা শেষ। তোমারটা দাও একটু।

কান্তা ছুঁড়ে দিলে পারত। কিন্তু প্রজাপতির মতো উড়ে আসে বিকাশের পাশে। আসলে বিকাশের কাজটা দেখার ইচ্ছে।

তখনই গলা-চেরা একটা কান্না।

বিকাশ আর কান্তা দুজনেই তাকায়। ঘাটের সামনে জড়ো হয়েছে বাড়ির বৌ-ঝিরা। তাদের একজনের কোলে ন্যাংটো বুঁচি। হাত-পা ছুঁড়ে তারই কান্না।

কান্তা ফিরে আসে নিজের জায়গায়। তার বুকের মধ্যে দুরু দুরু। রং চাপানোটাই কঠিন কাজ। ওয়াটারকালার। চাপাতে হবে একবারে। অয়েল পেনটিং-এর মতো ভুলচুক মেরামতির সুযোগ নেই এখানে।

বিকাশ রং চাপাতে শুরু করে দিয়েছে। তার পিছনে বেশ ভিড়।

পুকুর পাড়ে দাঁড়ানো বৌ-ঝিদের মধ্যে সত্যানন্দের শালী। তিন-চার দিন হলো বেড়াতে এসেছে। সত্যানন্দ নিত্যানন্দের ছোটভাই। বিকাশের পিছন থেকে সে নিজের শালীর দিকে হাঁক পাড়ে।

—অ পারুলি, উখেনে দাঁড়ি আছু কেন? ইখেনে আয় না। তর ফটোক তুলে দিবে। চলে আয়।

কাচ্চা-বাচ্চারা হিহি হাসিতে ফেটে পড়ে।

নিত্যানন্দ বাবলা গাছের নিচে। বিড়ি ধরিয়েছে। গায়ের রং কালো। কিন্তু হাতের তেলোটা লালচে-সাদা, দিনরাত জল-কাদা ঘেঁটে। তার মনের ভিতরটা এখন ঝুরঝুরে মাটির মতো নরম। শ্মশানের শূন্যতা নিয়ে পড়ে থাকা তাদের এই এক খণ্ড জমিতে হঠাৎ একটা উৎসবের উচ্ছ্বাস জেগে উঠতে দেখে। সিনেমা-থিয়েটার-যাত্রা-পাঁচালী দেখার সুযোগ হারানো জীবনে আজ যেন আকাশ থেকে পরীর ডানায় উড়ে

এসেছে হাসি-খুশি হয়ে দেখবার দুর্লভ কিছু মুহূর্ত। নিত্যানন্দ তার ছোট ছেলেকে ডাকে।

—অ রে, অ দুলে-এ-এ-এ।

বিকাশের ছবির পিছন থেকে দুলে কাছে এলে, চাপা গলায়

—ইনারা ভদ্‌রো বাড়ির ছেলেমেয়ে। ইনাদের তো কিছু খাবাতে হয়। তর মাকে বলে এট্টু চায়ের ব্যবস্থা কর।

—তমার কি মাথা খারাপ নাকি? মোরা যে চা খাই, ইনারা খাবেন? গুড়ের চা?

—থালে কি খাবাবি! মুড়ি-টুড়ি দেবার কথা বল, কিছু দিয়ে।

দুলে চলে যাচ্ছিল, আবার পিছু ডাক।

—অরা সব উখেনে জড়ো হয়ে আছে কেনে? উখেন থেকে কি দেখবে? ফটোক আঁকা দেখবে যদি তো ইদিকে আসতে বল না।

দুলের গলায় চিৎকার।

—অ মা, তমরা সবাই ইদিকে এস না। বাবা ডাকতেছেন।

যেন গৃহকর্তার অনুমতির জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল বৌ-ঝিরা। তারা ছোটখাট মিছিলে এগিয়ে আসে পুকুরের এ পাড়ে।

বিকাশের ছবিতে তখন চালাঘরগুলো উজ্জ্বল। সে পুকুরের জলে ছায়া নামাচ্ছে।

—অ ছোট্‌কা, তমার ঘরের চালাটা যে এগদম টিয়ে পাখির পালকের মতোন গো।

হো-হো হি-হি, হাসির ঝিরঝিরে হাওয়া বিকাশের পিছনে।

—হায়, দেখ গো, তমাদের ছাগলটার রঙ কি ছিল আর কি হয়ে গেল।

—বাড়ির পিছনে অত বড় গাছ লাগালে কবে গো মেজ্‌কা? আশুদ না শিরিষ?

কে একজন দৌড়ে গিয়ে তার ছোট খুড়ির আঁচল টানে।

—তুমি জল তুলতে এসেছিলে ঘাটে। দেখবে চলো না কি রঙ করে

দিয়েছে তমার শাড়ির।

ছোটখুড়িকে বিকাশের পিছনে টেনে এনে তার মুখে আবির গোলা হাসি।

—কি রকম বেনারসি পরিয়ে দিয়েছে, দেখেচ ?

ছোটখুড়ির পিছন পিছন বোন পারুলি। ইস্কুলে পড়েছে। থাকে শহর-ঘেঁষা অঞ্চলে। সকলের মধ্যে তার সাজ-গোজ, হাঁটা-চলাটাই বলে দেয়, সে কেউ নয় এ বস্তীর।

ছোটখুড়ির মুখে তার মনের ভিতরকার বিরক্তির ছায়া। কোথায় সে ? শুধু শাড়ি আর কলসি। সে ভেবেছিল মুখটা দেখতে পাবে নিজের। পারুলি ঠোঁট-কাটা। সে আর সকলকে শোনানোর মতো স্পষ্ট করেই বলে।

—চল্ তো। তুই না হাতী ?

কান্তা রঙ চাপাচ্ছে ধীরে ধীরে। বিকাশ বলেছিল, দেওয়ালের টেকস্-চারের কথা। সে কখনো পারে এই টেকস্‌চার আনতে ? এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল। হাড়-সার মানুষের বুকের পাঁজরা, কিংবা চোয়ালের হাড়ের মতো দেয়াল থেকে বেরিয়ে আছে বাঁশ-কঞ্চি। রঙ চাপাতে চাপাতে সে প্রায় বাড়িটার দোরগোড়ায়। ঐখানে ন্যাংটো মেয়েটা। মেয়েটার জন্যে মায়াবশত নয়, ছবিতে লাল রঙটাকে কাজে লাগানোর লোভেই ন্যাংটো মেয়েটার গায়ে একটা ফ্রক পরিয়ে দিতে চায় সে। মেয়েটার গায়ের রঙ ছিল কালো। কান্তা তাই বলে শুধু আম্বার লাগায় না। ছুইয়ে দেয় একটু ইয়েলো। লাল রঙের জামার জন্যে পাতলা অরেঞ্জের উপর চাপিয়ে দেয় খানিকটা ভারমিলিয়ন।

—আরে, আরে, অ বুঁচি তুই যে পুজোর জামা পেয়ে গেলুরে।

কান্তার পিছনে দাঁড়ানো ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলে কথাটা।

বুঁচি তখনো কেঁদে চলেছে।

—আবার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদু কেন ? তোর গায়ে কি রকোম

টুকুটুকে ফরোক পরি দিয়েছে দেখে যা।

তুলে ছুটে এসেছিল বুঁচিকে কোলে নিতে। সে হাত পা ছোঁড়ে।

—তোর কোলে যাবে নি। মোর কোলে আয়। তোর নতুন ফরোক দেখবি।

নিত্যানন্দর মেজ মেয়ে গিরির গায়ে ছেঁড়া ফ্রক। সে রোগা টিঙটিঙে। বুঁচি কিন্তু তার কোলে ওঠে হাত বাড়াতেই। বুঁচিকে কোলে নিতেই ধনুকের মতো বেঁকে যায় তার শরীরটা কোমরের মাঝখান থেকে দুপাশে।

—ঐ দেখ, দেখতে পাচ্ছু, তর গায়ে কি সোন্দর ফরোক। ওরে বাবা, কত টাকা দামের ফরোক। ই তো চাল্লিশ টাকা দামের ফরোক। বিলেঘাটার মারকিট থিকেন কেনা। তবু ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচোর কেঁদে চলেছু তুই? অ্যাঁ। অ দিদি, বলুন না গো, বুঁচির ফরোকটা কোতা থেকে কিনেছে?

কান্তা পিছন ফিরে ওদের দিকে। চোখে এমন চাউনী যেন কত-কালের বিবাহিত জীবন কাটিয়ে, তিন ছেলের মা হয়ে, এখন জেনে গেছে কখন কোন সন্তানের দিকে তাকাতে হবে কেমন চোখে।

—হ্যাঁ তো, লাল টুকটুকে জামাটা তো তোমার জন্যেই কিনে আনা হয়েছে বেলেঘাটার বিচিত্রা স্টোর্স থেকে।

বুঁচির দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ ঘাড় ঘুরয়ে নেয় ছবির দিকে। ওয়াটারকালার। কোনো একটা রঙ শুকিয়ে গেলই হার্ড হয়ে যাবে ছবি। ঘাড় ঘুরিয়েই তার চোখ কপালে। নিজের সর্বনাশ করে বসেছে নিজে। বুঁচির দিকে ঘুরে তাকানোর সময় তুলি ডুবিয়েছিল ক্রোম ইয়েলোর। অন্যমনস্কতায় তার থেকেই এক ফোঁটা রঙ পড়েছে পুকুরের জন্যে খালি রাখা জায়গায়।

—ঈস! কি করলাম দেখেছ?

বিকাশ ঘুরে তাকায়।

—কি?

—ক্রোম ইয়েলো পড়ে গেল পুকুরে।

—বেশি জল দিয়ে চট্ করে পাতলা করে মিশিয়ে দাও।

জলের মগে শুকনো ষোল নম্বর তুলিটা ডোবায় কান্তা। আর তখনই তার ঠিক পিছনে বুঁচির নিভে যাওয়া কান্নার আরো তীব্রতর বিস্ফোরণ।

—আম্মার জাম্মা কই? আম্মার জাম্মা?

বুঁচির কান্নাটা যেন কয়লার উনোনের ধোঁয়া। কান্তার মনটা তখন তেতো। এই কান্নাই আজ ডোবাবে তাকে। কেন যে এই কাঁদুনে মেয়েটাকে ঠিক তার পিঠের সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা!

না, গিরিও আর দাঁড়াতে পারে না। এমনই উদ্দাম বুঁচির হাত-পা ছোঁড়া যে টাল খেয়ে পড়ে যাবে যেন সে। ল্যাংচানো দৌড়ে সে বুঁচিকে পৌঁছে দেয় তার মায়ের কাছে। মায়ের কোলে গিয়ে আরও কর্কশ হয়ে ওঠে তার কান্না।

—আম্মার জাম্মা কই? আ-আ-আ-ম্মা-আ-আ-র···

বুঁচির মাকেও টলিয়ে দেয় তার কান্নার আছাড়-পাছাড়। বাইরের লোকের সামনে ভদ্রতা বজায় রেখেই ঘোমটার আড়ালের চাপা গলায় খানিকটা আদরের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় খানিকটা শাসন। কিন্তু বাগ মানানো যায় না তবুও। বুঁচির মায়ের দুই জা-ও কোলে নিয়ে কান্না থামাতে চায়। বুঁচি তাদের কোলে যেতে চায় না। মায়ের কোলে চেপেই বুকে-পিঠে কিল-লাথি মেরে তার বিকট কান্না।

বাধ্য হয়েই নিত্যানন্দ উঠে আসে বাবলা গাছের তলা থেকে। বুঁচিকে তার মায়ের কোল থেকে প্রায় ছিনিয়েই নেয় সে। কোলে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় অনেক দূর। বিকাশ ছবিটা রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওয়াটারকালার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে, ছবির আর কোথায় কি করা যেতে পারে, বিশেষ করে 'ডেপথ' বাড়ানোর ব্যাপারে।

—তোমার হয়ে গেল?

কান্তার প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে থাকে তার মনের অসহায়তা। সে

সামলাতে পারছে না। কতটা হাল্কা করতে হবে জেনেও সে এক জায়গায় লাগিয়ে বসেছে প্রুসিয়ান। ক্যাট ক্যাট করছে জায়গাটা।

কান্তার মেঘময় চোখের দিকে ঘুরে তাকায় বিকাশ।

—না, হয় নি। এমনি দেখছি।

—এদিকে এস না একটু।

—যাই।

যাই বলেও বিকাশ আসে না। নিজের ছবির মেরামতিতে বসে পড়ে।

আর তখনই তিনখানা চালাঘর আর পুকুর পাড়ে চক্কর মেরে নিত্যানন্দ বিকাশের ছবির পিছনে। বুঁচির কান্না থামে নি পুরোপুরি। তবে কান্নাটা সরু হয়ে গেছে। কান্নার চেয়ে ফোঁপানি বেশি।

—দেখেছু কি সোন্দর বাড়ি। ঐ ছ্যাখ খেজুর গাছ। ঐ ছ্যাখ তোর ছাগল। ওরে বাবা, ওটা কি রে? কাগ বসে আছে খড়ের চালে। ঐ ছ্যাখ, তোর ছোট্‌খুড়ি···

নিত্যানন্দ বিকাশের কাছ থেকে কান্তার ছবির পিছনে।

—এই ছ্যাখ, তোর তিলে দাদা, দেখতে পাচ্ছু, কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে···

তখনই নিত্যানন্দ-র কোল থেকে হাত বাড়িয়ে দেয় বুঁচি।

—আম্মার জাম্মা-আ-আ-আ···

আর সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পুরনো কান্নার বিকট জলোচ্ছ্বাস। নিত্যানন্দর রাগ এক লাফে ব্রহ্মতালুতে। কোল থেকে আছড়ে মাটিতে বসিয়ে গালে পিঠে পাগলের মতো চড় হাঁকাতে থাকে সে। কান্তা হাতের তুলি ছুঁড়ে উঠে এসে নিত্যানন্দর নাগাল থেকে সরিয়ে বুকে তুলে নেয়।

—ওকি, ওভাবে মারছেন কেন? এইটুকু, মেয়ে, মরে যাবে যে।

কান্তার ঝাঁঝালো ভর্ৎসনায় নিত্যানন্দ মাথা নিচু করে তার বাবলা গাছের দিকে। আর তখনই, ছেলে-পিলে, বৌ-ঝি, আর বয়স্করাও এক ছুটে কান্তার দিকে। বিকাশও ছবি ফেলে রেখে দৌড়ে আসে। কান্তাকে

সাহায্য করতে নয়। কান্তার ছবিটাকে বাঁচাতে। কিন্তু সে পৌঁছবার আগেই ছেলে-পিলেদের বেসামাল দৌড়ে কান্তার ছবির উপরে মগের রঙ-গোলা জল।

কান্তা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় বিকাশের গলার আপশোষ শুনে। নিজের ছবির শোচনীয় চেহারাটা দেখে নেয়। তবুও বুঁচিকে কোল থেকে ছাড়ে না।

মেয়েটার গায়ে লাল ফ্রক পরিয়ে সেই-ই তো উস্‌কে বাড়িয়ে দিয়েছে তার কচি মনের ভিতরে ঘুমনো ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার সলতেটাকে। প্রায়শ্চিত্তের দায়টা তারই।

বিকাশ কান্তার ছবিটাকে নিয়ে নিজের জায়গায়।

সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে বস্তীর চালাঘরটায়। যেন ঝড় আর বন্যায় বিধ্বস্ত।

মেয়েটার লাল ফ্রক মুছে গিয়ে রক্তের ধারায় গড়িয়ে পুকুরে। পুকুরের জল লাল।

গভীর অভিনিবেশে ঝুঁকে দ্রুত হাতে মোটা তুলির জলে ধুয়ে চলেছে বিকাশ কান্তার ছবিটাকে, আরও একবার নতুন করে রঙ চাপিয়ে বস্তীটাকে বাঁচানো যায় যাতে।

—